কাকাবাবু সমগ্র

কাকাবাবু ও একটি সাদা ঘোড়া

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

2021

সূচিপত্র

১. জোজো ভুরু কুঁচকে বলল 2
২. হোটেলটির নাম রত্নমঞ্জুষা 14
৩. তিনটি স্থানীয় ছেলেমেয়ে... 32
৪. প্রত্যেকদিন কাকাবাবুই আগে জেগে ওঠেন 68
৫. কাকাবাবুর জ্ঞান ফিরলে.. 92

১. জোজো ভুরু কুঁচকে বলল

জোজো ভুরু কুঁচকে বলল, এই বাড়িটায় এক হাজারটা ঘর আছে? যাঃ, বাজে কথা! সন্তু বলল, তুই গুনে দ্যাখ!জোজো বলল, শুধু শুধু কষ্ট করে। গুনতে যাব কেন? দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে। আমাদের কলকাতায় এক-একটা বিশাল বিশাল মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এ কত ঘর থাকে! বড়জোর আড়াইশোতিনশো! এ-বাড়িটা মোটেই তেমন কিছু বড় নয়। মাত্র তিনতলা!

সন্তু একটা আখ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খাচ্ছে। খানিকটা ছিবড়ে ফেলে দিয়ে বলল, তুই বাড়ি বাড়ি কী বলছিস? এটা বাড়ি নয়, প্যালেস। রাজপ্রাসাদ। প্যালেসের সঙ্গে কখনও আজকালকার মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এর তুলনা হয়? তা ছাড়া, কোথাও বলা হয়নি যে, এখানে হাজারটা ঘর আছে। আসলে আছে এক হাজারটা দরজা। সেই জন্যই এর নাম হাজারদুয়ারি।

জোজো আখ ছাড়াতে পারে না। সে আখের টুকরোটা ধরে আছে লাঠির মতন। কাকাবাবু একটু দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন একজন দাড়িওয়ালা লোকের সঙ্গে।

জোজো আবার বলল, এক হাজারটা দরজা মানেই তো এক হাজারটা ঘর থাকবে।

সন্তু বলল, মোটই তা নয়। অনেক ঘরের দুটো করে দরজাও থাকতে পারে। বাথরুমেরও একটা দরজা থাকে।

জোজো বলল, দুর বোক, তা হলে তো বাথরুমটাও একটা ঘর হল। সেটাও তো গুনতির মধ্যে পড়বে।

কাকাবাবু অন্য লোকটির সঙ্গে কথা শেষ করে এদিকে এসে বললেন, কী ব্যাপার, বাথরুমের কী কথা হচ্ছে?

সন্তু বলল, বাথরুম নয়, আমরা ভাবছিলাম, এই প্যালেসে যদি এক হাজারটা দরজা থাকে, তা হলে ঘর আছে কতগুলো? ঘরও কি এক হাজার? বাথরুম টাথরুম সব নিয়ে?

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, এই প্যালেসে এক হাজার দরজা আছে, আবার নেইও বটে।

জোজো জিজ্ঞেস করল, এটা একটা ধাঁধা?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, ধাঁধারই মতন। একটা সূত্র দিয়ে দিচ্ছি। দরজা আছে, কিন্তু কর্জাহীন, মানুষ ভুল করে, খোলে না কোনওদিন।

জোজো কিছু বলার আগেই সন্তু বলল, আসল দরজা নয়, দরজার ছবি আঁকা।

কাকাবাবু বললেন, ঠিক ধরেছিস। হাজারদুয়ারি নামটা সার্থক করার জন্য অনেক জায়গায় দেওয়ালে নিখুঁতভাবে দরজার ছবি আঁকা। দেখলে দরজা বলেই ভুল হয়।

সন্তু বলল, আমি একটা ভ্রমণকাহিনিতে পড়েছি, ফরাসিদেশের একটা রাজপ্রাসাদে আছে চারশো ঘর। এই হাজারদুয়ারি কি তার চেয়েও বড়?

কাকাবাবু দুদিকে মাথা নেড়ে বললেন, নাঃ! ফরাসিদেশের সেই প্যালেস আমি দেখেছি। সেটার নাম শার প্যালেস। সেটা এর চেয়ে অনেক বড়। মজার কথা কী জানিস, সেই শাবর প্যালেসে বাথরুম কটা বলতে পারিস? মাত্র একটা। তাও নতুন তৈরি হয়েছে, এখনকার কেয়ারটেকারের জন্য। আগেকার দিনে বাড়ির মধ্যে বাথরুম রাখার চল ছিল না। সেটাকে মনে করা হত, নোংরা, অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার! অবশ্য তখন তো পাম্প করে উপরে জল তোলাও যেত না!

জোজো অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, এর চেয়ে কত বড় বড় প্যালেস আমি দেখেছি। হাঙ্গারির একটা প্যালেসে ঘর আছে এগারোশো বত্রিশটা। আর জর্জিয়ায় এক হাজার একান্ন?

কাকাবাবু বললেন, সে যাই-ই হোক, আমাদের বাংলার মধ্যে এত বড় প্যালেস তো আর নেই। এটা দেখার জন্যই অনেকে মুর্শিদাবাদে আসে। ভিতরটাও দেখার মতন। আমি অনেকদিন আগে একবার এসেছি।

জোজো জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা কাকাবাবু, নবাব সিরাজদৌল্লা এত বড় একটা বাড়ি শুধু শুধু বানিয়েছিলেন কেন? ওঁর ফ্যামিলিতে কি অনেক লোক ছিল?

সন্তু বলল, তুই হিস্ট্রি একেবারে ভুলে মেরে দিয়েছিস! সিরাজের আমলের সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে। এটা তৈরি করেছেন হুমায়ুন।

জোজো বলল, হুমায়ুন মানে আকবরের বাবা?

সন্তু বলল ধ্যাত! আকবরের বাবা তো আগেকার লোক! এ অন্য হুমায়ুন। নবাব হুমায়ুন। এটা এমন কিছু পুরনোও নয়।

কাকাবাবু বললেন, দাঁড়া, দাঁড়া। শুধু হুমায়ুন বললে ভুল বোঝার আশঙ্কা আছে। বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর বাংলার সিংহাসন দখল করে নেওয়ার পর ইংরেজরা তার অনেক ক্ষমতাই কেড়ে নেয়। তারপর থেকে যারা নবাব হয়েছে, তারা একেবারেই ইংরেজদের হাতের পুতুল। সেই রকমই এক নবাবের নাম নাজিম হুমায়ুনজা। দেশ শাসন করার কোনও ক্ষমতা নেই, বিশেষ কোনও কাজই নেই। তাই তিনি শুধু বিলাসিতায় টাকা ওড়াতেন। এইরকম রাজপ্রাসাদ বানানোও তোক দেখানো ব্যাপার।

জোজো বলল, আমরা এবার ভিতরে যাব না?

কাকাবাবু বললেন, চলো। অনেক সিঁড়ি! সেই তো আমার পক্ষে মুশকিল। যাই হোক, আমি তো পুরোটা দেখব না। তোমরা দুজন সব কটা ঘর ঘুরে দেখে এসো। উপরে খুব ভাল ভাল ছবি আছে। আমি শুধু অস্ত্রাগারটা আর-একবার দেখব ভাল করে।

সামনের দিকে বিশাল চওড়া সিঁড়ি। সন্তু আর জোজো উঠে গেল লাফিয়ে লাফিয়ে। কাকাবাবুকে ক্র্যাচে ভর দিয়ে কষ্ট করে উঠতে হয়। একটা খোঁড়া পা নিয়েও তাঁর অন্য জায়গায় বিশেষ অসুবিধে হয় না, শুধু সিঁড়ির কাছেই জব্দ।

কাকাবাবু প্রায় উঠে এসেছেন উপরে, উপর থেকে নামছে একটি দল। তাদের মধ্য থেকে একজন লম্বামতো লোক একেবারে কাকাবাবুর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আপনি মিস্টার রাজা রায়চৌধুরী না?

কাকাবাবু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

এক-একটা বড় ঘটনার পর কাকাবাবুর ছবি ছাপা হয় খবরের কাগজে। গত বছর নানাসাহেবের গুপ্তধন আবিষ্কারের জন্য দারুণ হইচই পড়ে গিয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরা কাকাবাবুর সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেছিল রবীন্দ্রসদনে। কাকাবাবু সংবর্ধনা টংবর্ধনা পছন্দ করেন না, কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা জোর করেই নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কাকাবাবুকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলেন, কাকাবাবু তাঁকে বাধা দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন, সেই ছবি দেখানো হল সব কটা টিভি চ্যানেলে। ছাপা হল সব কটা কাগজের প্রথম পাতায়। সেই জন্যই এখন রাস্তায়ঘাটে লোকেরা কাকাবাবুকে দেখলেই চিনতে পারে।

এই লোকটি কাকাবাবুর চেয়েও বেশ খানিকটা লম্বা। মাথার লম্বা চুল পিছন দিকে গিট করে বাঁধা। চোখে কালো চশমা। পাজামার উপর একটা হলুদ সিল্কের পাঞ্জাবি পরা, তাতে এক জায়গায় পানের পিকের একটু দাগ।

লোকটি ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল, আমি আপনার বহুত ভকতো আছি, আপনার এক ডজন সে বেশি অ্যাডভেঞ্চার কহানি পড়েছি, আপকা কিতনা সাহস আর শক্তি। স্যার, আপনার পায়ের ধুলো একটু নিতে চাই।

কাকাবাবু বিব্রত হয়ে বললেন, না, না, তার দরকার নেই, দরকার নেই। এই তো হাতে হাত...

লোকটি আগেই ঝুঁকে পড়েছে।

কাকাবাবু তার হাত ধরতে গিয়েও পারলেন না। লোকটি কাকাবাবুর পা ধরতে গিয়ে তাল সামলাতে পারল না, কাকাবাবুর গায়ের উপর পড়ে গেল।

সে উপরের সিঁড়িতে আর কাকাবাবু নীচে, তাই কাকাবাবু ওর শরীরের ওজন সামলাতে পারলেন না। পড়ে গেলেন পিছন দিকে।

তলার সিঁড়িতে তাঁর মাথা ঠুকে গেল। তিনি আরও গড়িয়ে পড়ে যেতে পারতেন, সন্তু আর জোজো দৌড়ে এসে ধরে ফেলল তাঁকে।

লম্বা লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কেয়া হুয়া? কে আমাকে ঠেলা মারল?

তার সঙ্গের লোকটি বলল, কে তোমাকে ঠেলা মারবে? তুমি ব্যালান্স রাখতে পারোনি।

লম্বা লোকটি বলল, আরে ছি ছি ছি ছি। কী লোজ্জার কোথা! মিস্টার রায়চৌধুরী মাফ কিজিয়ে! আমি ক্ষোমা চাইছি!

কাকাবাবুর বেশ লেগেছে। কিন্তু তিনি উঃ-আঃ করছেন না। কখনও নিজের কষ্টের কথা প্রকাশ করেন না। একটুক্ষণ তিনি চুপ করে রইলেন, সন্তু

আর জোজো তাঁর প্যান্ট-শার্টের ধুলো ঝেড়ে দিতে লাগল।

লম্বা লোকটির ক্ষমা চাওয়া আর থামছেই না।

কাকাবাবু বললেন, আপনার লাগেনি তো? আমি ঠিক আছি। হঠাৎ পা পিছলে গেছে। এরকম অ্যাক্সিডেন্ট তো হতেই পারে!

লোকটি বলল, তবু আমি হাজারবার মাফি মাঙছি। আপনার মতন রেসপেক্টেবল মানুষ, আর আমি আপনার এত অ্যাডমায়ারার...

কাকাবাবু অস্বস্তি চাপা দিয়ে বলে উঠলেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে!

লোকটি পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে বলল, যদি কখনও দোরকার লাগে, প্লিজ কল মি, আমি আপনাকে কখনও কিছু হেল্প করতে পারলে ধোন্য হোবো?

কাকাবাবু কার্ডটা হাতে নিলেন কিন্তু পড়লেন না। লোকটির মুখ ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, আচ্ছা ভাই, এখন আমরা ভিতরে যাব!

ওদের ঘিরে খানিকটা ভিড় জমে গেছে। এর মধ্যে আবার দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে এসে বলল, কাকাবাবু, অটোগ্রাফ!

কাকাবাবু বললেন, এই রে, এরপর যে হাজারদুয়ারি বন্ধ হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি ওদের কাগজে সই করে দিয়ে তিনি উঠতে লাগলেন উপরে।

একেবারে উপরে উঠে চারদিকটা একবার দেখে নেওয়ার পর কাকাবাবুদের আবার অন্য দিক দিয়ে নীচেই নামতে হল। কারণ, কাকাবাবু শুধু অস্ত্রাগারটা দেখবেন বলেছেন।

ভিতরে এসে তিনি জোজোকে বললেন, আমি যখন প্রথমবার এখানে আসি, তখন তো আর খোঁড়া ছিলাম না, আর তোমাদেরই মতো বয়স। পুরো প্যালেসটা তো দেখেছিলাম বটেই, আর গঙ্গায় সাঁতার কেটেছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে, মনে আছে।

সন্তু বলল, আমিও সাঁতার কাটব। জোজোটাকে এত করে সাঁতার শিখতে বলি—

জোজো বলল, এবারে শিখে নেব। তবে নদীফদিতে নয়, সুইমিং পুলে। সাঁতার শিখতে আর কতক্ষণ লাগে! আমার এক মামা সাঁতার কেটে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছিলেন।

কাকাবাবু বললেন, নরানাং মাতুলঃ ক্রম। তার মানে কী জানো, নর মানে মানুষ ঠিক তার মামার মতো হয়। তোমার মামা যখন অত বড় সাঁতারু, তুমিও পারবে!

সন্তু জিজ্ঞেস করল, জোজো, তোর তিন জন মামাকে আমি চিনি। ইনি কোন জন রে?

জোজো বলল, ইনি আর-একজন। আমার মামাতো মামা!

মামাতো মামা মানে কী?

মায়ের নিজের ভাই নয়, মামাতো ভাই। তা হলে আমার মামাতো মামা হল না? এখন বহুদিন আর তিনি সাঁতার কাটেন না অবশ্য।

কেন?

একবার একটা হাঙর ওঁর ডান পা কেটে নিয়েছে। সেই থেকে উনি আর কখনও সমুদ্রের ধারে যান না! এমনকী, কোনও নদী, পুকুর, জলই দেখতে চান না। এখন থাকেন আল্পস পাহাড়ের একটা গুহায়। সেখানে একটা ঝরনা পর্যন্ত নেই।

তা হলে তেষ্টা পেলে কী করেন?

বরফ আছে তো। চতুর্দিকে বরফ। সেই বরফ কড়মড় করে চিবিয়ে খান।

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, বাব্বাঃ! আল্পস পাহাড়ে থাকেন? নাম কী তোমার সেই মামার?

জোজো বলল, আগে নাম ছিল বরুণ রায়। এখন আমরা বলি বরফমামা।

তারপরই প্রসঙ্গ বদলে সে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা কাকাবাবু, এক-একটা তলোয়ার কিংবা বর্শা এত বড় কেন? আগেকার মানুষরা কি অনেক লম্বা ছিল?

কাকাবাবু বললেন, এসব অস্ত্র তো খুব আগেকার মানুষদের নয়। তা ছাড়া মানুষরা কখনওই এখনকার মানুষদের চোখে আকারে তেমন বড় ছিল না। চার-পাঁচ হাজার বছর আগেকার যেসব মানুষদের কঙ্কাল পাওয়া গেছে, তা দেখেই বোঝা যায়।

অস্ত্রাগারটিতে নানারকম অস্ত্র সাজানো। অনেক ঢাল-তরোয়াল, বন্দুকপিস্তল।

কোনওটা আলিবর্দি খাঁ-র, কোনওটা মুর্শিদকুলি খাঁ-র। বিদেশের কিছু অস্ত্রও আছে।

সন্তু বলল, মানুষ কেন এত অস্ত্র বানায়? শুধু মানুষ মারার জন্যই!

কাকাবাবু বললেন, পৃথিবীতে মানুষকে মারার তো আর কেউ নেই। রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানব কিছু নেই। বাঘ সিংহ গরিলারাও মানুষের সঙ্গে পারে না। মানুষ যদি মানুষকে না মারত, তা হলে পৃথিবীটা কত শান্তির জায়গা, সুন্দর জায়গা হতে পারত?

জোজো বলল, তার বদলে এখন অ্যাটম বোমা বানাচ্ছে! এক-একখানা বোমায় এক-একটা শহর খতম। কয়েকটা দেশের কাছে যত অ্যাটম বোমা আছে, সেগুলো সব একসঙ্গে ফাটালে গোটা পৃথিবীটাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

কাকাবাবু বললেন, একবার না, তিনবার।

জোজো বলল, আমি এই পচা পৃথিবীতে থাকবই না। মঙ্গলগ্রহে চলে যাব। সব ঠিক হয়ে গেছে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, সব ঠিক হয়ে গেছে?

জোজো বলল, হ্যাঁ, পাঁচ বছরের মধ্যেই তো মঙ্গলগ্রহে বাড়ি-ঘর তৈরি হবে। আমাদের জন্য একটা বাড়ি বুক করা আছে।

সন্তু বলল, আমি এই পৃথিবী ছেড়ে কোথাও যাব না। যতই যা হোক, আমার নিজের দেশটাই ভাল।

কাকাবাবু বললেন, ঠিক আছে জোজো, তুমি মঙ্গলগ্রহে বাড়ি করলে আমি আর সন্তু বেড়াতে যাব একবার। আপাতত এসো, এই জায়গাটা দ্যাখা শেষ করি। এই দ্যাখো, এটা সিরাজদ্দৌলার বর্শা!

সন্তু বলল, এত বড় বর্শা। নিশ্চয়ই খুব ভারী। এটা নিয়ে সিরাজ যুদ্ধ করতে পারতেন?

কাকাবাবু বললেন, না না, এগুলো সাজিয়ে রাখা হত। সিরাজ যুদ্ধ করতে জানতেন কিনা তাতেই সন্দেহ আছে। পলাশির যুদ্ধে উনি নিজে কিছুই করেননি। অনেককাল আগে, রাজা কিংবা রাজপুত্ররা নিজেরাও খুব ভাল লড়াই করতে জানতেন। আলেকজান্ডার কিংবা চেঙ্গিজ খান, এঁরা ছিলেন অসাধারণ সাহসী যোদ্ধা। তার পরের দিকে রাজা-বাদশারা নিজেরা বসে থাকতেন তাঁবুতে, যুদ্ধ করে মরত সাধারণ সৈন্যরা।

জোজো বলল, কাকাবাবু, এই ছুরিটা দেখুন। এটাকে এত যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে কেন?

একটা ট্রে-তে লাল মখমল পাতা, তার উপরে রয়েছে একটা লম্বা ছুরি, হাতির দাঁতের হাতল। ছুরিটায় এখনও যেন লেগে আছে রক্ত।

কাকাবাবু সেটার সামনে এসে বললেন, এই ছুরিটার দারুণ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এটা মহম্মদি বেগের ছুরি। বলতে গেলে এই ছুরিটার জন্যই আমাদের দেশটা পরাধীন হয়ে গিয়েছিল।

জোজো সন্তুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, আহম্মদি বেগটা কে রে?

সন্তু বলল, আহম্মদি না মহম্মদি। তুই ইতিহাস পড়িসনি?

জোজো বলল, অত আমার নামধাম মনে থাকে না।

কাকাবাবু বললেন, সব নাম মনে রাখা খুবই শক্ত। একটা মাত্র ঘটনা ছাড়া মহম্মদি বেগের আর কোনও উল্লেখই নেই। তবে, ইতিহাস বই পড়ার চেয়েও সিনেমা বা থিয়েটারে দেখলে নামটাম সব মনে থাকে। আমাদের ছেলেবেলায় সিরাজদৌল্লা নামে একটা নাটক খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সেটা আবার রেকর্ডও করা হয়েছিল। তখনকার দিনে তো টিভি ছিল না। সিডি কিংবা ক্যাসেট প্লেয়ারও ছিল না। শুধু ছিল রেডিয়ো আর গ্রামাফোন। রেডিয়োতে এই নাটকের রেকর্ড বাজানো হত প্রায়ই। পাড়ায় পাড়ায় পানবিড়ির দোকানেও বাজত রেডিয়ো। শুনে শুনে নাটকটা আমাদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। নির্মলেন্দু লাহিড়ি নামে একজন অভিনেতা কাঁপাকাঁপা গলায় দারুণ অভিনয় করতেন সিরাজের। শেষ দৃশ্যে আমাদের চোখে জল এসে যেত। পলাশির যুদ্ধে সেনাপতি মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় তো ইংরেজের কাছে হেরে গেলেন সিরাজ। পালাতে বাধ্য হলেন ছদ্মবেশে। ধরাও পড়ে গেলেন ভগবানগোলা নামে একটা জায়গায়। পায়ের নবাবি জুতোটা নাকি বদলাতে ভুলে গিয়েছিলেন।

জোজো জিজ্ঞেস করল, নবাবি জুতো কীরকম হয়?

কাকাবাবু বললেন, জুতোর উপর হিরে-জহরতও বসানো থাকত বোধহয়। নবাবরা তো নিজেরা কখনও জুতো পরতে জানতেন না। কেউ একজন জুতো পরিয়ে দিত, খুলেও নিত। পালাবার সময় তাড়াহুড়োয় জুতো খোলার লোক পাওয়া যায়নি। সেই জুতো দেখেই তাকে চেনা গিয়েছিল। ধরা পড়ার পর তো সিরাজকে বন্দি করে আনা হল মুর্শিদাবাদে। নাটকটায় আছে, সেই সময় একদিন দারুণ একখানা বক্তৃতা দিয়ে সিরাজ লোক খ্যাপাবার চেষ্টা করেছিলেন। সে লেকচার শুনে আমাদেরও রক্ত গরম হয়ে যেত। লোকেরাও খেপে উঠছিল। সেই সময় তারা যদি সিরাজকে উদ্ধার করে নিতে পারত, তা হলে আবার ইতিহাস অন্যরকম হয়ে যেত। তখনই মহম্মদি বেগের প্রবেশ। মিরজাফরের ছেলে মিরন, তারই এক চ্যালা এই মহম্মদি বেগ। সে চিৎকার করে বলল, সে সুযোগ আর তোমাকে দেব না শয়তান! খোলা ছুরি বসিয়ে দিল সিরাজের বুকে। ব্যস শেষ, বেজে উঠল করুণ বাজনা।

ঘটনাটা বলতে বলতে গলা চড়িয়ে কাকাবাবুও প্রায় অভিনয় করে ফেললেন, একটা ভিড় জমে গেল তাঁকে ঘিরে।

একটি স্কুলের ছাত্র জিজ্ঞেস করল, সিরাজ যদি পালাতে পারতেন, তা হলে কী হত?

কাকাবাবু বললেন, সিরাজ তো তখনও নবাব। তিনি আবার সৈন্যসামন্ত জোগাড় করতে পারতেন। ফরাসিদের সাহায্য নিতে পারতেন। আবার একটা যুদ্ধ হত, তাতে ইংরেজরা হেরেও যেতে পারত। বাংলার স্বাধীনতা হারাতে হত না। কিন্তু মহম্মদি বেগের একটা ছুরির আঘাতে সব আশা-ভরসা শেষ হয়ে গেল। ওই একটা কুকীর্তি করার জন্য মহম্মদি বেগের নাম রয়ে গেল ইতিহাসে।

ছেলেটি আবার জিজ্ঞেস করল, মহম্মদি বেগ মারল কেন?

কাকাবাবু বললেন, তার সম্পর্কে আর কিছু জানি না। মিরনের হুকুমে মারতে পারে। কিংবা সিরাজের উপরে তার নিজের কোনও রাগও ছিল হয়তো।

ছেলেটি সরল রাগের সঙ্গে বলল, লোকটাকে একবার হাতের কাছে পেলে...

সবাই হেসে উঠল।

কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, তোরা এবার অন্য ঘরগুলো দেখে আয়। আমি বাইরের সিঁড়িতে গিয়ে বসছি।

ফেব্রুয়ারি মাস। শীত এখনও শেষ হয়নি, দুপুরবেলার রোদও ভালই লাগে। কাকাবাবু ক্রাচ দুটো পাশে রেখে বসলেন একেবারে উপরের সিঁড়িতে। আজ ছুটির দিন নয়, তবু এখানে যথেষ্ট ভিড়। কলকাতা থেকেও গাড়ি ভরতি ভরতি লোক আসছে হাজারদুয়ারি আর মুর্শিদাবাদ দেখতে।

কাকাবাবু একবার মাথার পিছনটায় হাত বুলোলেন। ফেটে যায়নি বটে, তবে বেশ লেগেছে, এখনও কিছুটা ব্যথা আছে।

হঠাৎ তার মনে হল, খানিক আগে লোকটা তাঁকে প্রণাম করতে এসে তাল সামলাতে পারেনি! না ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়েছিল? হাত দিয়ে তাঁকে ঠেলেছিল ঠিকই, তবে সেটাও অনিচ্ছাকৃত হতে পারে! শুধু শুধু একটা লোক তাঁকে ঠেলে ফেলার চেষ্টা করবে কেন? আবার বলাও যায় না। অনেক লোকেরই রাগ আছে তার উপরে।

শার্টের পকেট থেকে তিনি সেই লোকটির দেওয়া কার্ডটা বের করে দেখলেন। লোকটির নাম রাকেশ শর্মা, তলায় লেখা ক্লথ মার্চেন্ট। ঠিকানা ভাগলপুর। একজন জামা-কাপড়ের ব্যবসায়ীর কেন রাগ থাকবে তাঁর ওপর?

একটু পরে নানারকম বাজনা বাজাতে বাজাতে এল একটা দল। তাদের মধ্যে ঘোড়ায় চড়া দুজন লোক। সামনের চত্বরে এসে সেই লোক দুটি ঘোড়া থেকে নামল। একজনের পোশাক সাহেবের মতন, আর-একজনের মাথায় পালক বসানো সাদা মুকুট। দুজনেরই কোমরে তলোয়ার। সেই তলোয়ার খুলে ওরা ঠকাঠক করে লড়াই শুরু করে দিল, আর তাদের ঘিরে ঢাক ঢোল আর সানাই বাজাতে লাগল বাজনদাররা।

এরা বোধহয় কোনও যাত্রাপার্টি। কাকাবাবু বুঝতে পারলেন, এরা দুজন সেজেছে সিরাজদৌল্লা আর লর্ড ক্লাইভ। ওরা লড়াইয়ের অভিনয় করে দেখাচ্ছে! সিরাজের সঙ্গে ক্লাইভের এরকম লড়াই হওয়া দূরে থাক, কোনওদিন সামনাসামনি দেখা হয়েছিল কিনা সন্দেহ। একটু পরেই এই নকল ক্লাইভ হেরে গিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

কাকাবাবু হাসলেন। এতদিন পর এরা ইতিহাসকে উলটে দিতে চাইছে।

২. হোটেলটির নাম রত্নমঞ্জুষা

হোটেলটির নাম রত্নমঞ্জুষা। একেবারে নতুন। তেমন বড় নয়, দোতলা একতলা মিলিয়ে বারোটি ঘর। সামনে ও পিছনে অনেকখানি বাগান। সামনের বাগানে একটা ফোয়ারা রয়েছে, সন্ধের পর সেখানে অনেকরকম জলের ধারা বেরোয়। সব মিলিয়ে দেখতে বেশ সুন্দর।

কাকাবাবুর একটা মিটিং ছিল বহরমপুরে। সেখানে তাঁর জন্য সার্কিট হাউজের ঘর ঠিক করা ছিল। কিন্তু কাকাবাবু জানিয়ে দিলেন যে, তিনি বহরমপুরের বদলে মুর্শিদাবাদ শহরে থাকবেন। এখানে এলে পুরনো দিনের ইতিহাসের অনেক কথা মনে পড়ে। সন্তু আর জোজো আগে কখনও মুর্শিদাবাদে আসেনি। ওদেরও দেখা হবে অনেক কিছু।

জিয়াগঞ্জে একটা পুকুর খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া গেছে তিনখানা অষ্টধাতুর মূর্তি। পুরনো আমলের দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু ঠিক কত পুরনো আর কীসের মূর্তি, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তিনজন ইতিহাসের পণ্ডিতকে ডাকা হয়েছে মূর্তিগুলো দেখাবার জন্য। এখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইন্দ্রজিৎ দত্ত কাকাবাবুর খুব ভক্ত, তিনি কাকাবাবুকেও আনিয়েছেন। এইসব ব্যাপারে কাকাবাবুর মতামতের মূল্য আছে।

এই হোটেলে ঢোকার সময়েই জোজো জিজ্ঞেস করেছিল, মঞ্জুষা মানে কী রে সন্তু?

সন্তু বলল, তুই মঞ্জু মানে জানিস না? রত্ন মানে জানিস তো?

জোজো বলল, ভ্যাট, ইয়ারকি মারবি না। রত্ন মানে সবাই জানে। জুয়েল।

সন্তু বলল, যেমন তুই একখানা রত্ন! আর মঞ্জুষা মানে প্যাটরা।

জোজো বলল, প্যাটরা? সে আবার কী? কখনও শুনিনি!

সন্তু বলল, কখনও শুনিসনি? আলবাত শুনেছিস। লোকে বাক্স-প্যাটরা বলে না? অর্থাৎ রত্নটত্ন যেখানে রাখা হয়। সিন্দুকও বলতে পারিস।

জোজো বলল, হোটেলের নাম সিন্দুক? সর্বনাশ, ঘরগুলোতে আলোহাওয়া নেই?

কাকাবাবু বললেন, তা নয়। মানে হল, এই হোটেলে যারা থাকবে, তারা প্রত্যেকেই এক-একটা রত্ন। নামটা একটু অন্যরকম ঠিকই! মালিকের নাম জানিস? অয়স্কান্ত দাস। অয়স্কান্ত মানে জানিস?

সন্তু চুপ।

জোজো বলল, কী রে, বল! খুব তো তোর বাংলা নলেজ!

সন্তু বলল, এটা জানি না। না জানলে স্বীকার করতে লজ্জা নেই।

কাকাবাবু বললেন, অনেক শব্দ শুধু ডিকশিনারিতেই থাকে, এমনিতে চল নেই। অয়স্কান্ত মানে চুম্বক। ম্যাগনেট। অয় মানে হচ্ছে লোহা। লোহাকে যে টানে, সে অয়স্কান্ত।

জোজো বলল, কাকাবাবু, এবার আমি আপনার একটা ভুল ধরব? আপনি ডিকশিনারি বললেন কেন? উচ্চারণ তো ডিকশনারি?

কাকাবাবু বললেন, ঠিক ধরেছ তো! ছেলেবেলা থেকে আমার এই ভুলটা হয়। উচ্চারণটা আমি বাংলা করে নিয়েছি। সাহেবরা বলে ডিকশন আরি!

দোতলার ঘরের সামনে একটা গোল বারান্দা। সেখানে বেতের চেয়ারে বসে চা খেতে খেতে গল্প হচ্ছে সন্ধেবেলা। চায়ের সঙ্গে এরা দিয়েছে গরম গরম খাস্তা কচুরি।

সন্তু বলল, আচ্ছা কাকাবাবু, হাজারদুয়ারি দেখলাম, বেশ ভাল লাগল। কিন্তু ওটা তো তেমন পুরনো নয়। সিরাজের আমলের কিছুই নেই?

কাকাবাবু বললেন, নদীর ওপারে আছে খোশবাগ। সেখানে আছে আলিবর্দি আর সিরাজের সমাধি। কাল সকালে যাব। ওখানে গেলেই মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। সিরাজকে যে কী ভয়ংকর নিষ্ঠুর ভাবে মারা হয়েছিল, সেই কথা মনে পড়ে।... এখানে আরও পুরনো আছে কাটরা মসজিদ।

জোজো বলল, এই জায়গাটা একসময় বাংলার রাজধানী ছিল, এখন দেখলে যেন বিশ্বাসই করা যায় না। কেমন যেন মরামরা ভাব।

কাকাবাবু বললেন, শুধু রাজধানী নয়, একসময় এই মুর্শিদাবাদ শহর যে কী বিরাট আর কত জমাট ছিল, তা এখন দেখলে সত্যিই বিশ্বাস করা যায় না। নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ শহর ছিল চব্বিশ মাইল লম্বা আর চোদ্দো মাইল চওড়া। আমাদের কলকাতার চেয়েও বড়। ইলেকট্রিক ছিল না। কিন্তু গঙ্গার দুপারে জ্বলত মশালের আলো। কত সব বড় বড় বাড়ি। লর্ড ক্লাইভ যখন প্রথম মুর্শিদাবাদ শহরে আসে, তখন এখানকার সব বড় বড় বাড়ি দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, এ তো লন্ডন শহরেরই মতো। তবে লন্ডনের চেয়েও এখানে বড়লোকদের সংখ্যা বেশি। ভেবে দ্যাখ, তখন লন্ডন পৃথিবীতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শহর। তার সঙ্গে বাংলার রাজধানীর তুলনা।

জোজো আবার জিজ্ঞেস করল, এত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে গেল কী করে?

কাকাবাবু বললেন, মুর্শিদাবাদ কিন্তু খুব পুরনো শহর নয়। যেমন হঠাৎ গজিয়ে উঠেছিল, খুব তাড়াতাড়ি এখানকার চেহারা পালটে যায়। আবার হঠাৎই এখানকার গৌরবের দিন শেষ হয়ে যায়। তখন বেড়ে ওঠে কলকাতা শহর। অনেক ধনী লোক আর বড় বড় ব্যবসায়ীর চলে যায় কলকাতা শহরে। শেষ হয়ে গেল মুর্শিদাবাদের গৌরবের দিন। তার আগে তো কলকাতার প্রায় কিছুই ছিল না।

তখন শুধু ঘোড়ার গাড়ি চলত?

ঘোড়ার গাড়ি, পালকি। অনেক লোক হেঁটেই যাতায়াত করত। মনে করো, কেউ এখান থেকে ঢাকায় যাবে। আটদিন-দশদিন ধরে হাঁটত। এখনও এখানে কেউ কেউ ঘোড়ায় চড়ে যায়। তুই দেখিসনি সন্তু?

হ্যাঁ, দেখেছি।

এখনও তো বোধহয় একজন কেউ ঘোড়া চালিয়ে যাচ্ছে, এখান দিয়ে ওই যে খটাখট শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এর মধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে। সামনের রাস্তায় একটা ঘোড়া ছুটে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল ঠিকই, কিন্তু কিছু দেখা গেল না।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, সেকালের নবাব পরিবারের বংশধররা কি এখনও মুর্শিদাবাদে থাকে?

কাকাবাবু বললেন, না বোধহয়। তারা কে কোথায় সব হারিয়ে গেছে। এখন আর তাদের কেউ খোঁজও রাখে না।

জোজো জিজ্ঞেস করল, নবাব সিরাজদ্দৌল্লার কোনও ছেলেমেয়ে ছিল না?

সন্তু বলল, যাঃ, সিরাজকে তো খুন করা হয়েছিল মাত্র একুশ না বাইশ বছর বয়সে। ওইটুকু বয়সে কারও ছেলেমেয়ে হয়?

কাকাবাবু হেসে বললেন, সেই সময় ছেলেদের আর মেয়েদের বিয়ে হত খুব কম বয়সে। সিরাজ তো ছিল আলিবর্দির আদুরে নাতি, অল্প বয়স থেকেই নানারকম পাকামি করতে শেখে। তাই তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দেওয়া হয়। একটা নয়, সিরাজের দু-তিনটে বউ ছিল। সবচেয়ে প্রিয় বেগম ছিল লুতফুন্নেসা। তার একটা মেয়েও জন্মেছিল।

জোজো বলল, সেই মেয়েটা কোথায় গেল? তাকেও মেরে ফেলেছিল?

কাকাবাবু বললেন, সবটা শুনতে চাও?

জোজো বলল, ইয়েস।

সন্তু বলল, আমাদের ইতিহাস বইয়ে তো একটুখানি লিখেছে মোটে। সিরাজের যে মেয়ে ছিল, তা জানতুমই না।

কাকাবাবু বললেন, তেরো-চোদ্দো বছর বয়সেই সিরাজ বেশ বখাটে হয়ে গিয়েছিল। কারও কথা শুনত না। যা খুশি তাই করত, অনেক খারাপ কাজও করেছে। সেই জন্য অনেকে তাকে পছন্দ করত না। আলিবর্দি অন্যদের বদলে এই বাচ্চা নাতিটাকেই যখন বাংলার সিংহাসনে বসাতে চাইলেন, তা-ও অনেকের পছন্দ হয়নি। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে সিরাজ হল নবাব। তখন কিন্তু তার স্বভাব অনেকটা বদলে গেল, বাংলার উন্নতির জন্য দায়িত্ব নিয়ে রাজ্য শাসন করার চেষ্টা করল। ইংরেজরা নানা বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল, তাদেরও ঠান্ডা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বেচারি তো বেশি সময়ই পেল না, নানা ষড়যন্ত্রে রাজ্য হারাতে হল।

জোজো জিজ্ঞেস করল, কতদিন তিনি নবাব ছিলেন?

কাকাবাবু বললেন, প্রায় পনেরো মাস।

সন্তু বলল, আচ্ছা কাকাবাবু, অত দূর ইংল্যান্ড থেকে জাহাজে চেপে এসে ইংরেজরা আমাদের দেশটা দখল করে নিল। আমাদের দেশের মানুষ কি যুদ্ধ করতে জানত না?

কাকাবাবু বললেন, জানবে না কেন? পলাশির যুদ্ধে সেনাপতি মিরজাফর যদি তার সৈন্যদের নিয়ে একপাশে পুতুলের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে না থাকত, তা হলে ইংরেজরা হেরে ভূত হয়ে যেত! দলাদলি আর বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই আমাদের অনেক কিছু নষ্ট হয়ে যায়!

সন্তু বলল, ইস, মিরজাফর যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করত, তা হলে সিরাজকে প্রাণ দিতে হত না!

কাকাবাবু বললেন, মিরজাফর একা কেন, জগৎশেঠরাও সমানভাবে দোষী। এই জগৎশেঠরা ছিল দারুণ ক্ষমতাবান, বলতে গেলে রাজ্যের সব টাকাপয়সা কন্ট্রোল করত তারাই। টাকাপয়সাই তো আসল ক্ষমতা। জগৎশেঠ সিরাজকে একেবারে পছন্দ করত না, সে ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে চেয়েছিল সিরাজকে সরিয়ে মিরজাফরকে সিংহাসনে বসাতে। মিরজাফরও সেই লোভে রাজি হয়ে গিয়েছিল।

জোজো জিজ্ঞেস করল, সিরাজের মেয়ের নাম কী? তার কী হল?

কাকাবাবু বললেন, দাঁড়াও, বলছি বলছি! সিরাজ তো মুর্শিদাবাদ থেকে। পালাতে বাধ্য হল, তখন ভয়ে তার সঙ্গে আর কেউ যেতে চায়নি। শুধু বেগম লুতফা বলল, সে যাবেই যাবে, স্বামীকে ছাড়বে না। তাতে তার যা হয় হোক। এই লুতফা মেয়েটি ছিল খুবই ভাল। তার আসল নাম ছিল রাজ কানোয়ার। হিন্দু পরিবারে জন্ম। বাচ্চা বয়েসে কেউ তাকে লুঠ করে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাসী বানিয়ে ফেলে। ক্রীতদাসী হিসেবেই সে সিরাজের মায়ের কাছে আসে সেবা করতে। তখন তার নাম হয় লুতফুন্নেসা বা লুতফা।

জোজো বলল, আগেকার দিনের লোকেরা কী খারাপ ছিল! তারা গোরু-ছাগলের মতো মানুষও বিক্রি করত?

কাকাবাবু বললেন, হু। এখনও খারাপ লোক কম নেই। এখনও... যাই হোক। সেই লুতফাকে দেখতে ছিল অসাধারণ সুন্দরী, আর স্বভাবটাও খুব মধুর। তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে সিরাজ তাকে নিজের বেগম করে নিল। সিরাজের সৌভাগ্যের দিনে সে যেমন ছিল পাটরানি, দুর্ভাগ্যের দিনেও স্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল, কোলে তার শিশুকন্যা। কিছু দূর যাওয়ার পর বাচ্চা মেয়েটার তো খিদে পাবেই। বড়রা খিদে সহ্য করে অনেকক্ষণ থাকতে পারে। কিন্তু বাচ্চারা পারবে কেন? বাচ্চাটা কাঁদতে লাগল। অথচ কোনও জায়গায় থামলেই বিপদ। কিন্তু বাচ্চার কান্না থামাতে না পারলে কোন মাবাবা চুপ করে থাকতে পারে। নৌকো করে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখা গেল এক ফকিরের কুটির। সিরাজ ভাবল, ফকির মানুষ, নিশ্চয়ই দয়ালু হবে। তার নাম দানশাহ ফকির। ছদ্মবেশী বাংলার

নবাব তার কাছে মেয়ের জন্য একটু দুধ আর খাবারটাবার ভিক্ষে চাইল। ফকির ঠিক চিনতে পারল নবাবকে। সে চুপিচুপি খবর দিয়ে দিল মিরজাফরের জামাই মিরকাশিমকে। তার সৈন্যরা এদের সবাইকে বন্দি করে নিয়ে গেল মুর্শিদাবাদে!

জোজো জিজ্ঞেস করল, ওই ফকির নবাবকে ধরিয়েছিল কেন? তারও টাকার লোভ ছিল?

কাকাবাবু বললেন, কী জানি! নানারকম গল্প শোনা যায় বটে, সেসব থাক, সৈন্যরা ওদের বন্দি করে নিয়ে এল মুর্শিদাবাদে। তারপর তো মহম্মদি বেগ ছুরি বসাল সিরাজের বুকে। শুধু তো একবার ছুরি বসায়নি, তলোয়ার দিয়েও কুপিয়ে কুপিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিল সিরাজের শরীর। সে শরীরটা একটা হাতির পিঠে শুইয়ে ঘোরানো হল সারা মুর্শিদাবাদ শহর। একসময় সেই ছিন্নভিন্ন শরীর নামিয়ে দেওয়া হল আমিনা বেগমের বাড়ির সামনে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, আমিনা বেগম কি সিরাজের মা?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ। লোকগুলো কী নিষ্ঠুর। মায়ের কাছে কেউ ছেলের ছিন্নভিন্ন দেহ দেখাতে আনে? আমিনা বেগম আলুথালুভাবে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই মৃতদেহের উপর। মিরনের চেলারা আমিনা বেগমকে টেনে-হিচড়ে সরিয়ে দিল সেখান থেকে। তারপর সিরাজের মৃতদেহ আবার তুলে নিয়ে গিয়ে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল মুর্শিদাবাদের প্রধান বাজারের কাছে। দেহটাকে সমাধি দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা হল না, ভয়ে কেউ ধারেকাছেও এল না। অনেকক্ষণ এইভাবে পড়ে থাকার পর একজন বুড়ো লোক সাহস করে এসে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের মৃতদেহ সমাধি দিতে নিয়ে গেল নদীর ওপারে খোশবাগে।

সন্তু বলল, সিরাজের বেগম আর তার মেয়ের কী হল?

কাকাবাবু বললেন, মিরনের ইচ্ছে ছিল সবাইকেই মেরে ফেলার। কিন্তু ততদিনে তো ইংরেজরা এসে পড়ে অনেক কিছু দেখাশোনা করছে। ইংরেজদের আর যত দোষই থাক,

ওইভাবে মেয়েদের খুন করা পছন্দ করে না। সম্ভবত তাদের নির্দেশেই সিরাজের মা, সিরাজের মাসি ঘষেটি বেগম, সিরাজের দিদিমা আর লুতফা ও শিশুকন্যাটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ঢাকায়। মিরন ঢাকার শাসনকর্তাকে চুপিচুপি নির্দেশ পাঠাল, ওখানে সবাইকে খতম করে দিতে হবে। ঢাকার শাসনকর্তা লোকটি খারাপ ছিল না, সে জানিয়ে দিল, আমি এরকম পাপ কাজ করতে পারব না। তখন মিরন নিজের এক

চেলাকে পাঠাল ঢাকায়। সেই লোকটা কে বল তো?

জোজো বলল, আহম্মদি বেগ।

সন্তু বলল, আবার আহম্মদি বলছিস? মহম্মদি বেগ!

কাকাবাবু বললেন, ঠিক ওকে পাঠানো হয়েছিল কিনা সেকথা ইতিহাসে লেখা নেই। তবে আমরা ধরে নিচ্ছি, মহম্মদি বেগই হবে। মহম্মদি বেগ কাজ সারতে চাইল সকলের চোখের আড়ালে। ঢাকার পাশেই যে-নদী, তার নাম বুড়িগঙ্গা। একদিন আমিনা বেগম আর ঘষেটি বেগমকে এক নৌকোয় চাপিয়ে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে গেল সেই নদীতে। মাঝখানে এসে দুই মহিলাকেই জোর করে ঠেলে ফেলে দিল জলে। সাঁতার জানতেন না, অসহায়ভাবে দুজনে ডুবে মরলেন। এই ঘটনা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় খুব শোরগোল পড়ে গেল ঢাকায়। মহম্মদি বেগ আর বাকিদের খুন করার সুযোগ পেল না, পালিয়ে এল মুর্শিদাবাদে। সিরাজের দিদিমা, লুতফা আর তার মেয়ে সাত বছর বন্দি হয়ে রইল ঢাকায়।

জোজো বলল, মিরন লোকটা মেয়েদেরও খুন করতে চেয়েছিল কেন?

কাকাবাবু বললেন, ও চেয়েছিল, সিরাজকে একেবারে নির্বংশ করে দেবে। ওই ফ্যামিলিতে আর কেউ বেঁচে থাকবে না। যাতে আর কেউ কখনও বাংলার সিংহাসনের দাবি করতে না পারে। ও তো ধরেই নিয়েছিল, বৃদ্ধ মিরজাফরের পর ও-ই নবাব হবে। তা হতে পারেনি অবশ্য। শোনা যায়, আমিনা বেগম অভিশাপ দিয়েছিলেন বলে মিরন

বজ্রাঘাতে মারা যায়। আর মিরজাফর সিরাজের সামনে কোরান ছুঁয়ে মিথ্যে কথা বলেছিল, সেই পাপে তার হাতে কুষ্ঠ রোগ হয়। এসব অনেক পরে বানানো গল্প। খুব সম্ভবত সত্যি নয়। একালে অভিশাপ টভিশাপ ফলে না। তা হলে তো কত লোককেই ওইভাবে শাস্তি দেওয়া যেত। পাপ করলেও কুষ্ঠ রোগ হয় না, কত পাপী চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সন্তু বলল, কাকাবাবু, তুমি কিন্তু এখনও সিরাজের মেয়ের নাম বলোনি।

কাকাবাবু বললেন, পরপর সব আসতে হবে তো। ঢাকায় বুড়ি দিদিমা আর ছোট মেয়েকে নিয়ে সাত বছর বন্দিনী হয়ে রইল লুতফা। তারপর যখন মিরজাফর, মিরন টিরন সকলে মারা গেছে, তখন ক্লাইভেরই দয়ায় তাদের আবার ফিরিয়ে আনা হল ঢাকায়। মেয়ের তখন প্রায় দশ বছর বয়স, তার নাম উম্মত জহুরা। সিরাজদ্দৌল্লার বিপুল ধনসম্পত্তি ছিল, সবই তো লুটপাট হয়ে গেছে। ওদের খাওয়াপরার খরচ আসবে কোথা থেকে? ইংরেজ কোম্পানি তখন লুতফাকে একটা চাকরি দেয়। খোশবাগে যে আলিবর্দি ও সিরাজের সমাধিস্থান, সেই জায়গাটা দেখাশোনার কাজ। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লুতফা ওই কাজ করে গেছে। প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলা সে স্বামীর সমাধির পাশে একটা দীপ জ্বেলে দিত। এই কাজের জন্য তার মাইনে ছিল তিনশো পাঁচ টাকা। আর মেয়ের জন্য মাসোহারা একশো টাকা। অল্প বয়সেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয় লুতফা। কিন্তু সিরাজের মেয়ের ভাগ্যটাই খারাপ। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই মারা যায় তার স্বামী। এর মধ্যে উম্মত জহুরার পরপর চারটি মেয়ে জন্মে গিয়েছে। তাদের নামও শুনতে চাস?

সন্তু বলল, হ্যাঁ।

কাকাবাবু বললেন, শরফুন্নেসা, আসমতুন্নেসা, সাকিনা আর আমাতুলসার্দি। এই চারটে ছোট ছোট মেয়ের ভার মায়ের উপর চাপিয়ে উম্মত জহুরাও একদিন চোখ বুজল। সেই মেয়েরা একটু বড় হতে না-হতেই লুতফা তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিল। দুজনের বিয়ে হয়েও গেল। তৃতীয় মেয়ে সাকিনার বিয়ের সময় টাকাপয়সায় আর কুলোয় না। তখন

লুতফা আবার কোম্পানির কাছে। সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখল। সে চিঠির কোনও উত্তর আসেনি।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, সাকিনার বিয়ে হল না?

কাকাবাবু বললেন, বিয়ে হয়েছিল হয়তো কোনওরকমে। আমি আর কিছু জানি না। কোনও বইয়ে আর ওদের কথা লেখেনি। সিরাজের বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ইতিহাসের পাতা থেকে। চল, এবারে আমরা একটু গঙ্গার ধার থেকে ঘুরে আসি। অনেক ইতিহাসের কথা হয়েছে। এখন একটু টাটকা হাওয়া খাওয়া দরকার।

জোজো বলল, আজ হোটেলে পেঁয়াজকলি দিয়ে মাংস রান্না হবে বলেছে। খিদে বাড়াতে হবে।

সন্তু বলল, তুই বুঝি রান্নাঘরে গিয়ে খবর নিয়ে এসেছিস? কখন গেলি রে?

জোজো বলল, রান্নাঘরে যেতে হবে কেন? নোটিশ বোর্ডে লিখে দিয়েছে আজকের মেনু, শুধু পেঁয়াজকলি দিয়ে কষা মাংস আর ভাপা ইলিশ।

আমি দুটোই খাব!

হোটেলের বাইরে সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে আছে।

কাকাবাবু বললেন, চল, হেঁটেই যাই। গঙ্গা তো বেশি দূর নয়।

কাকাবাবু ক্রাচ ছাড়া হাঁটতে পারেন না। তবু তিনি হাঁটার অভ্যেসটা রেখে দিয়েছেন। যদি বেশি সিঁড়িটিড়ি না থাকে কিংবা পাহাড়ি জায়গা না হয়, তা হলে তিনি অনায়াসে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে পারেন।

এখানে গঙ্গার ধারে টানা রাস্তা নেই। তবে মাঝেমাঝে কিছু বেড়াবার জায়গা আছে। মোটামুটি একটা ফাঁকা জায়গা দেখে কাকাবাবু দাঁড়ালেন। নদীর দিকটা রেলিং দেওয়া, কয়েকটা বসবার বেঞ্চও আছে।

জোজো একঠোঙা চিনেবাদাম কিনে নিয়ে এল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, এই যে বললি খিদে বাড়াবি? বাদাম খেলে পেট ভরে যাবে না?

জোজো বলল, বাদামে পেট ভরে না। আগেকার দিনে রাজা-মহারাজারা দুপুরে খেতে বসার আগে পেস্তাবাদামের শরবত খেতেন। একবার উদয়পুরের মহারাজা আমাদের নেমন্তন্ন করেছেন, দুপুরবেলা খাবার টেবিলে গিয়ে বসতেই প্রথমে মস্ত বড় একটা শ্বেতপাথরের গেলাস ভরতি কী একটা শরবত এনে দিল। টেবিলটা জানিস তো, সোনার, আর থালা-বাটিটাটি সব রুপোর, শুধু গেলাসগুলো পাথরের। আমি ভাবছি, টেবিলে কত ভাল ভাল খাবার সাজানো রয়েছে, শুধু শুধু শরবত খেতে যাব কেন? তখন মহারাজ বললেন, খাও খাও, জোজোমাস্টার, এ শরবত খেলে পেটে আগুন জ্বলবে।

সত্যিই তাই রে, যেই শরবতটা শেষ করলাম, অমনিই পেটের মধ্যে দাউদাউ করে খিদের আগুন জ্বলে উঠল, বুঝলি!

সন্তু বলল, কী করে বুঝব। আমাদের তো কখনও রাজা-মহারাজাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন জুটবে না!

কপকপ শব্দ শুনে সকলে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। একজন কেউ ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। ঘোড়াটার রং সাদা, যে চালাচ্ছে সেও সাদা পোশাক পরে আছে। হাতে তার একটা ছপটি।

লোকজন সরে গেল, ঘোড়াটা ছুটে গেল তিরের বেগে।

কাকাবাবু বললেন, বাঃ, বেশ দেখতে লাগল। এইরকম একটা ঐতিহাসিক শহরে ঘোড়াই ভাল মানায়।

সন্তু বলল, আমি ঘোড়ায় চড়াটা ভাল করে শিখব। একটু একটু জানি!

জোজো বলল, আমি বাবা ওসবের মধ্যে নেই। আমার ঘোড়ার চেয়ে মোটরসাইকেল বেশি ভাল লাগে।

আজ আকাশে বেশ জ্যোৎস্না আছে। হাওয়া দিচ্ছে ফিনফিনে। নদীর বুকে একটা নৌকোয় ক্যাসেট প্লেয়ারে সিনেমার গান বাজছে।

কাকাবাবু হেসে বললেন, আগে নৌকোর মাঝিরা নিজেরাই গান গাইত। এখন ক্যাসেট বাজে।

জোজো বলল, আগে ক্যাসেট কিংবা রেকর্ড ছিল না। তাই মাঝিরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আজেবাজে গান গাইত।

সন্তু বলল, আজেবাজে গান? তুই ভাটিয়ালি শুনিসনি?

জোজো বলল, আমার ওসব গান ভাল লাগে না। আমি শুধু মডার্ন গান শুনি!

সন্তু বলল, তুই আসলে গান কিছুই বুঝিস না।

জোজো বলল, তুই একটা মডার্ন গান শুনবি? লেটেস্ট। পা পোঁ পোঁ পা পা–

ওদের দুজনের এরকম খুনসুটির সময় কাকাবাবু মজা পেয়ে হাসতে থাকেন।

একটা টাকমাথা লোক কাকাবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার হাতে একটা সিগারেট।

সে বলল, আপনার কাছে দেশলাই আছে স্যার!

কাকাবাবু বললেন, না, দুঃখিত। আমি বিড়ি-সিগারেট খাই না! লোকটি কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু চমকে উঠে বলল, ও আপনি, সরি, সরি স্যার!

সে সরে গেল সামনে থেকে। পকেট থেকে বার করল একটা মোবাইল ফোন।

সন্তু বলল, তোমায় চিনতে পেরেছে।

কাকাবাবু বললেন, সেই তো মুশকিল। এবার ভাবছি দাড়ি রাখব।

জোজো বলল, দাড়িতে আরও বেশি চেনা যায়! বরং গোঁফটা কেটে ফেলুন?

কাকাবাবু বললেন, গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা! নাঃ, গোঁফ কামাচ্ছি না। কোনও কিছু চিন্তা করার সময় গোঁফে হাত বুলোলে বেশ সুবিধে হয়!

একটু পরে কাকাবাবু বললেন, চল, এবার ফেরা যাক। একটু শীতশীত লাগছে।

সন্তু বলল, আর-একটু থাকি।

জোজো বলল, না, না চল। এতক্ষণে মাংস রান্না হয়ে গেছে।

আবার শোনা গেল ঘোড়ার খুরের কপকপ শব্দ।

সন্তু বলল, আর-একটা ঘোড়া!

খানিকটা কাছে আসার পর দেখা গেল, এটা সেই আগের ঘোড়াটাই, সাদা রঙের, তার সওয়ারেরও সাদা পোশাক।

লোকজন সরে যেতেই ঘোড়াটা হঠাৎ কাকাবাবুদের দিকে মুখ ফেরাল।

প্রথমে মনে হল, সওয়ারটি বুঝি কাকাবাবুর সঙ্গে কথা বলতে আসছে। কিন্তু ঘোড়াটার গতি কমল না। এগিয়ে আসছে খুব জোরে। কাকাবাবু বলে উঠলেন, আরে!

ঘোড়াটা হুড়মুড়িয়ে এসে গায়ে পড়বে! কাকাবাবুদের সরে যাওয়ার উপায় নেই, পিছনে রেলিং। অনেক লোক চেঁচিয়ে উঠল ভয়ে।

ঘোড়াটা একেবারে কাছে চলে এসেছে। কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, জোজো, সন্তু, শুয়ে পড়, শুয়ে পড়!

সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভার বের করে ফায়ার করলেন দুবার!

সেই আওয়াজে ঘোড়াটা থমকে গিয়ে, সামনের দুপা উপরে তুলে চি-হি- হি-হি করে ডেকে উঠল।

আচমকা থেমে যাওয়ায় ঘোড়ার আরোহীও তাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে।

বহু লোক ছুটে এল এদিকে। অনেকেরই ধারণা হল, কাকাবাবু বুঝি গুলি করেছেন ঘোড়াটাকে। তা কিন্তু নয়, কাকাবাবু গুলি করেছেন শূন্যে। তবে এখনও রিভলভারটা তাক করে রেখেছেন মাটিতে পড়ে যাওয়া লোকটির দিকে।

লোকটির বোধহয় বেশ লেগেছে, উঠে দাঁড়াতে পারছে না।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন লোক ছুটে এসে সেই লোকটিকে তুলে ধরতে ধরতে ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করল, আপনার কোথায় লেগেছে? বেশি লাগেনি তো?

লোকটি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তাকে দেখে সকলেরই চমক লাগে। এমন সুন্দর চেহারার মানুষ খুব কম দ্যাখা যায়। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স, নিখুঁত শরীরের গড়ন, দুধের মতো ফরসা রং, টানাটানা চোখ। কথায় বলে, ঠিক যেন রাজপুত্র। কিন্তু আজকাল তো রাজপুত্রটুত্র নেই, সিনেমার নায়কদের এরকম চেহারা হয়। ঠিক যেন ফিল্ম স্টার। সে পরে আছে সিল্কের কুর্তা শেরওয়ানি।

অন্য লোকটি তার পোশাকের ধুলো ঝেড়ে দিতে দিতে বলল, লাগেনি তো! আপনার লাগেনি তো?

যুবকটির মুখে কেমন যেন গর্বিত ভাব। সে গম্ভীরভাবে বলল, না, লাগেনি। ঠিক আছে।

সে কাকাবাবুর কাছে ক্ষমা চাইল না।

কাকাবাবুই জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, ঘোড়াটাকে সামলাতে পারেননি?

সে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, ঘোড়াটা হঠাৎ খেপে গিয়েছিল।

ঘোড়াটা এখন চুপ করে দাঁড়িয়ে ফ-র-র ফ-র-র করে নিশ্বাস ফেলছে। জোরে জোরে।

কাকাবাবু এগিয়ে গিয়ে ঘোড়াটার গলায় আদরের চাপড় মারলেন। তিনি কুকুর আর ঘোড়া খুব ভালবাসেন। এইসব জন্তুও তো বুঝতে পারে, তার ছোঁয়া পেলে এরা খুশি হয়। ঘোড়াটি দুবার মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, এই তো ও বেশ শান্ত হয়ে গিয়েছে। চমৎকার ঘোড়াটি!

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল একজন পুলিশ। সে জিজ্ঞেস করল, এখানে গুলি চালাল কে?

কাকাবাবু বললেন, আমি।

পুলিশটি কাকাবাবুর দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে বলল, আপনার হাতে রিভলভার? দিন, ওটা আমাকে দিন।

কাকাবাবু বললেন, না। আপনাকে কেন দেব?

পুলিশটি এবার কড়া গলায় বলল, দেবেন না মানে? ওরকম অস্ত্র সঙ্গে রাখা বেআইনি, তা জানেন না?

কাকাবাবু বললেন, লাইসেন্স থাকলে মোটেই বেআইনি নয়। আমার লাইসেন্স আছে। আত্মরক্ষার জন্য আমি সবসময় এটা সঙ্গে রাখি।

পুলিশটি বলল, আপনি শুধু শুধু গুলি ছুড়েছেন, কার গায়ে লেগেছে?

কাকাবাবু বললেন, শুধু শুধু গুলি ছুড়িনি। অবশ্য কারও গায়েও লাগেনি।

পুলিশটি বলল, তবু আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে।

জোজো ফস করে বলে উঠতে গেল, এখানকার ডিস্ট্রিক্ট...

সন্তু তাড়াতাড়ি তার মুখ চাপা দিল। পুলিশের বড়কর্তা আমার বন্ধু, কিংবা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আমার ভক্ত, এই ধরনের কথা লোকজনের সামনে বলা কাকাবাবু একেবারেই পছন্দ করেন না।

কাকাবাবু হাসিমুখে বললেন, না, আমি এখন থানায় যাব না। হোটেলে ভাল ভাল রান্না হয়েছে। আমাদের খিদেও পেয়েছে। আমাদের হোটেলের নাম রত্নমঞ্জুষা। সেখানে আমার খোঁজ করবেন। আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী। আমি এখানে টুরিস্ট হিসেবে এসেছি।

সিনেমা স্টারের মতো যুবকটি এর মধ্যে ঘোড়ায় চেপে বসেছে। ঘোড়াটা চলতে শুরু করল উলটো দিকে। ভিড় ফাঁক হয়ে গেল।

কাকাবাবু বললেন, চল সন্তু, আমরা হোটেলে ফিরি।

পুলিশটি ভ্যাবাচ্যাকার মতো দাঁড়িয়ে রইল।

খানিকটা যাওয়ার পর জোজো জিজ্ঞেস করল, ওই লোকটা ঘোড়া চালিয়ে আমাদের দিকে তেড়ে আসছিল কেন? গুলির আওয়াজ না শুনলে ঘোড়াটা আপনার গায়ের উপর এসে পড়ত ঠিক।

কাকাবাবু বললেন, হয়তো ইচ্ছে করে তেড়ে আসেনি। সামলাতে পারেনি বোধহয়। এমনও হতে পারে, নতুন ঘোড়া চালানো শিখছে।

জোজো বলল, একই দিনে দুবার অ্যাক্সিডেন্ট? হাজারদুয়ারির সামনে সেই লোকটা গায়ের উপর এসে পড়ল।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, একই দিনে দুবার। একটু আশ্চর্য ব্যাপারই বটে!

সন্তু বলল, ভিড়ের মধ্য থেকে যে-লোকটা এসে ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়া সিনেমার হিরোকে মাটি থেকে তুলল, তাকে আমি চিনতে পেরেছি। সে-ই একটু আগে কাকাবাবুর কাছে দেশলাই চাইতে এসে বলেছিল, ও, আপনি!

জোজো বলল, ঠিক তো! সেই টাকমাথা লোকটা। কাকাবাবুকে চেনে। সিনেমার হিরোর সঙ্গেও ওর আগে থেকে পরিচয় আছে।

সন্তু বলল, সত্যিই এখানে কোনও সিনেমার শুটিং হচ্ছে নাকি? ক্যামেরা তো দেখলাম না!

কাকাবাবু বললেন, তা জানি না। তবে আমরা তো এখানে কোনও রহস্যের তদন্ত করতে আসিনি। বহরমপুরে আসার কাজটাও মিটে গেছে। এখন শুধু বেড়ানো। এখানে তো কারও সঙ্গে আমাদের শত্রুতা থাকার কথা নয়। এই সুন্দরমতো ছেলেটাকে আমি জীবনে আগে কখনও দেখিনি। ও শুধু শুধু আমার গায়ের উপর ঘোড়া চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে কেন?

জোজো বলল, ছেলেটাকে দেখতে সুন্দর হলেও বেশ অভদ্র! ওরকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার জন্য ক্ষমাটমাও চাইল না।

কাকাবাবু বললেন, হয়তো খুব লজ্জা পেয়েছে। তা ছাড়া লোকের সামনে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলে মানসম্মান থাকে না। তাই মুখ দিয়ে কথা বেরোয়নি। আর সত্যিকারের ফিল্ম স্টার যদি হয়, তারা তো বাইরের লোকের সঙ্গে কথাই বলতে চায় না।

জোজো বলল, অমিতাভ বচ্চন আর শাহরুখ খান, এদের চেয়ে বেশি নামকরা ফিল্ম স্টার তো এখন আর কেউ নেই। এরা দুজনেই দেখা করতে এসেছিল আমার বাবার সঙ্গে। কয়েকটা মন্ত্রপড়া ফুল নেওয়ার জন্য। পুরো একবেলা কাটিয়ে গেল আমাদের বাড়িতে। অমিতাভ বচ্চন তোদিব্যি বাংলা বলতে পারে। একসময় কলকাতায় চাকরি করত তো। আমার দিদির ছোট ছেলেটার সঙ্গে লুডো খেলল আর খুব মজা করতে লাগল। আর শাহরুখ খান নারকোল কোরা দিয়ে চিড়েভাজা খেয়ে এত খুশি যে, তিন বাটি খেয়ে ফেলল!

সন্তু বলল, আবার ঘোড়ার আওয়াজ! শোনো শোনো!

খটাখট শব্দটা আসছে পিছন দিক থেকে। একসময় দেখা গেল, সেই সাদা ঘোড়া ও তার আরোহীকে।

জোজো বলল, চলুন, চলুন, আমরা একটা বাড়ির বারান্দায় উঠে পড়ি।

কাকাবাবু বললেন, তার দরকার হবে না। এবারে ঘোড়াটা আমাকে দেখতে পেলে কাছাকাছি এসে নিজেই থেমে যাবে!

৩. তিনটি স্থানীয় ছেলেমেয়ে

সকালবেলা প্রথমে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এল তিনটি স্থানীয় ছেলেমেয়ে। এরা একটা ক্লাবের সদস্য, ওদের নাম রাজীব, নাসের আর এলা। নাসেরকে কাকাবাবুর একটু চেনাচেনা মনে হল। বোধহয় আগে কোথাও দেখেছেন।

ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়ে গিয়েছে। জোজো আর সন্তু জামা-প্যান্ট পরে বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি। কাকাবাবুই এখনও আলস্য করছেন, রাত্তিরের পোশাক ছাড়েননি। অজ গঙ্গার ওপারে খোশবাগ দেখতে যাওয়ার কথা।

এলা বলল, কাকাবাবু, আজ বিকেলে আমাদের ক্লাবের একটা সাহিত্যসভা আছে। সেখানে আপনাকে বিশেষ অতিথি হতে হবে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আমাকে চিনলে কী করে? কী করে জানলে, আমরা এই হোটেলে আছি?

নাসের বলল, আমি তো আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। আপনি নানাসাহেবের সিন্দুক উদ্ধার করলেন, তখন আমরা কয়েকজন আপনার ইন্টারভিউ নিতে গিয়েছিলাম। এখানে আপনার মতো বিখ্যাত কোনও লোক এলে সবাই জেনে যায়।

এলা বলল, এই জেলার ডি এম ইন্দ্রজিৎ দত্ত। তিনি আজ আমাদের ফাংশনের প্রধান অতিথি। বহরমপুর থেকে আসছেন। তিনিই তো বললেন, আপনাকে ধরতে।

কাকাবাবু বললেন, তোতামাদের সভায় কী হবে?

রাজীব বলল, প্রথমে হবে পরিবেশ দূষণ নিয়ে আলোচনা। তারপর কবিতা আর গল্প পাঠ।

কাকাবাবু হেসে বললেন, ওরে বাবা, সেখানে গিয়ে আমি কী করব? আমি বক্তৃতাও দিতে পারি না, গল্প-কবিতাও কখনও লিখিনি!

নাসের বলল, আপনি দু-চার কথা বললেই আমরা অনেক উৎসাহ পাব।

কাকাবাবু বললেন, কত সব গুণিজন আসবেন। তাঁদের মধ্যে আমি বসলে কী মনে হবে জানো তো? হংস মধ্যে বকো যথা। সবাই হাঁস আর

আমি একটা বক।

এলা বলল, মোটেই তা নন। আপনি তো রাজা। কোনও কথা শুনব না, আপনাকে যেতেই হবে।

কাকাবাবু বললেন, না না। তোমরা বরং সন্তু আর জোজোকে নিয়ে যাও। ওরা ভবিষ্যতে লেখক হতেও পারে।

জোজো বলল, আমি এখনও লিখতে শুরু করিনি। আর ঠিক দুবছর পরে...তখন লিখব, সেটাই হবে বেস্ট। আর টুয়েন্টি-টুয়েন্টিতে পাব নোবেল প্রাইজ।

কাকাবাবু বললেন, আর মাত্র পনেরো বছর বাদে? তা হলে আর দেরি করলে হবে না জোজো। এখনই শুরু করো।

রাজীব সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, তুমিও লেখো নাকি ভাই?

সন্তু লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে বলল, না না! আমি শুধু পড়ি।

জোজো বলল, সন্তু সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন, দারুণ সাইকেল চালায়, রিভলভারও চালাতে পারে। ক্যারাটে জানে। যাদের এত গুণ থাকে, তারা লিখতে টিখতে পারে না। আমি ওসব কিছুই পারি না। তাই আমি লেখক হব।

সকলে হেসে উঠল।

এই সময় বারান্দার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল পুরোদস্তুর পুলিশের পোশাক পরা একজন। কোমরের বেল্টে পিস্তল, হাতে একটা বেঁটে লাঠি। এ

অবশ্য কাল সন্ধেবেলায় গঙ্গার ধারের সেই পুলিশটি নয়।

এ বলল, কাকাবাবু, একটু আসতে পারি?

কাকাবাবু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

পুলিশটি ভিতরে এসে কাকাবাবুর দুই হাঁটু ছুঁয়ে অভিবাদন করে বলল, স্যার, আমি লোকাল থানার সাব-ইনস্পেক্টর জাভেদ ইমাম। আমি আপনার একজন ভক্ত। আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে পারি?

কাকাবাবু বললেন, নিশ্চয়ই পারো। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসো।

জাভেদ অন্য তিনজনের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাদের তো চিনি। তোমরা একটু বাইরে যাবে?

কাকাবাবু জোর দিয়ে বললেন, না, ওরা কেন বাইরে যাবে? ওদের সঙ্গে আমার কথা শেষ হয়নি। তোমার যা বলবার ওদের সামনেই বলতে পারো।

জাভেদ থতমত খেয়ে একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, কাল সন্ধের পর গঙ্গার ঘাটে আপনার সামনে একটা ঝঞ্ঝাট হয়েছিল?

কাকাবাবু হালকাভাবে বললেন, এমন তো কিছু ঝাট নয়। একটা সুন্দর চেহারার ছেলে ঘোড়া ছোটাচ্ছিল। ভাল করে এখনও হর্স-রাইডিং শেখেনি। হুড়মুড় করে ঘোড়াসুদ্ধ আমার গায়ের উপর এসে পড়ছিল আর কী! তাই আমি দুটো ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে ঘোড়াটাকে

থামাই। তুমি জানতে এসেছ তো, আমার সেই রিভরভারের লাইসেন্স আছে কিনা? আছে। তোমাকে দেখাচ্ছি!

জাভেদ বলল, না না। আপনার তো লাইসেন্স থাকবেই। আপনাকে কত বিপদআপদে পড়তে হয়। আমি জানতে চাইছি, বোকা-হাঁদা কনস্টেবলটা আপনাকে চিনতে পারেনি। সে আপনার সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি তো?

কাকাবাবু বললেন, না। ওসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।

জাভেদ বলল, সেই লোকটি আপনার দিকেই ঘোড়া নিয়ে ছুটে আসছিল কেন?

কাকাবাবু বললেন, আশ্চর্য ব্যাপার। সেটা আমি জানব কী করে? সেই লোকটিকেই তো জিজ্ঞেস করা উচিত। কালকের পুলিশটি কিন্তু তাকে কিছুই জিজ্ঞেস করেনি। সেও কিছুই না বলে চলে গেল।

নাসের জিজ্ঞেস করল, জাভেদভাই, কে ঘোড়া চালাচ্ছিল?

জাভেদ বলল, সেলিম। তাকে চেনো? এ শহরের সবাই তাকে খুব পছন্দ করে। নিশ্চয়ই ঘোড়াটাকে সামলাতে পারেনি।

কাকাবাবু বললেন, ঘোড়াটার নামে দোষ দিয়ো না। খুব ভাল জাতের ঘোড়া। যাই হোক, আমি ব্যাপারটাকে কোনও গুরুত্ব দিতে চাই না!

জাভেদ কথা ঘুরিয়ে বলল, কাকাবাবু, আপনি কাল হাজারদুয়ারি দেখতে গিয়েছিলেন?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ। তবে পুরোটা তো আমি ঘুরে দেখিনি। শুধু অস্ত্রাগার। বাকিটা সন্তু আর জোজো দেখেছে।

জাভেদ বলল, আপনি যখন অস্ত্রাগারে ছিলেন, তখন সেখানে তো আরও অনেক লোক ছিল, তাই না? তাদের মধ্যে কাউকে আপনার সন্দেহজনক চরিত্রের বলে মনে হয়েছিল?

কাকাবাবু বললেন, না। এ-কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

জাভেদ বলল, কালই অস্ত্রাগার থেকে একটা মূল্যবান জিনিস চুরি গিয়েছে।

কাকাবাবু বললেন, তাই নাকি? কী চুরি গিয়েছে?

জাভেদ বলল, মহম্মদি বেগের ছুরি।

কাকাবাবু রীতিমতো অবাক হয়ে বললেন, সে কী? সেটা তো এমন কিছু দামি জিনিস নয়। আর কিছু চুরি যায়নি?

জাভেদ বলল, না, আর কিছু চুরি যায়নি। শুধু যে কাচের বাক্সটার মধ্যে ছুরিটা ছিল, সেটাই নেই!

কাকাবাবু বললেন, মিউজিয়াম থেকে মাঝে মাঝে কিছু জিনিসপত্র চুরি যায়, সেগুলো গোপনে বিদেশে পাঠিয়ে বেশি দামে বিক্রি করা যাবে বলে। কিন্তু মহম্মদি বেগের ছুরির কী দাম আছে? বাইরের কেউ তো মহম্মদি বেগকে চিনবেই না। কী করে চুরি হল? ওই ঘরে দুজন পাহারাদার ছিল দেখেছি।

জাভেদ বলল, কী করে চুরি হল, তা এখনও কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আপনারাই বোধহয় শেষ দেখেছেন ছুরিটাকে।

কাকাবাবু বললেন, তার মানে কি আমার উপরেই সন্দেহ পড়ছে? আমিই সরিয়েছি? কিন্তু ওসব ছুরিটুরি জমাবার শখ তো আমার নেই।

জাভেদ জিভ কেটে বলল, না না, সে সন্দেহ করব কেন? আমি বলতে এসেছি, আপনি তো সেই সময় কাছাকাছি ছিলেন, যদি আমাদের একটু সাহায্য করতে পারেন।

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, আমি কী কী পারি না তা বলছি। আমি চুরি-ডাকাতির ব্যাপারে কিছু করতে পারি না। কোথাও খুনটুন হলে ডিটেকটিভদের মতো সেই রহস্যের সমাধান করতেও শিখিনি। গুপ্তধন উদ্ধারের জন্য ছোটাছুটি করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালবাসি। ইংরেজদের ফাঁকি দিয়ে নানাসাহেব কোথায় লুকিয়েছিলেন, সম্রাট কনিষ্কের পাথরের মুন্ডুটা কোথায় গেল, আন্দামানের আদিবাসীদের মধ্যে একটা অনির্বাণ আলো কী করে জ্বলে, এইসব রহস্য নিয়ে মাথা ঘামানো আমার শখ, বুঝলে?

জাভেদ বলল, তা তো জানিই। তবু, আপনি যখন এখানে আছেন...

কাকাবাবু বললেন, শোনো। অস্ত্রাগার দেখে বেরিয়ে আসার পর আমি যখন সিঁড়িতে বসে আছি, তখন একটা ঘটনা ঘটেছিল। কোথা থেকে একটা যাত্রাপার্টির লোক এসে, তাদের দুজন লর্ড ক্লাইভ আর সিরাজ সেজে লড়াই শুরু করে দিল। অনেক লোক ভিড় করে দেখতে লাগল সেই কাণ্ড। মিউজিয়ামের গার্ডরাও বোধহয় উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল। তাদের সেই অন্যমনস্কতার সুযোগে কেউ ওই কাচের বাক্সটা সরিয়ে ফেলতে পারে। আমি যদি পুলিশের লোক হতাম, তা হলে ওই যাত্রাদলের খোঁজ করতাম। কেন ওরা ঠিক ওইখানে বাজনাটাজনা বাজিয়ে খেলা দেখাতে লাগল।

জাভেদ কিছু বলার আগেই হোটেলের মালিক এসে বললেন, স্যার, একটু আসতে পারি? আপনার জন্য একটা চিঠি আছে।

কাকাবাবু বললেন, আসুন, আসুন অয়স্কান্তবাবু!

ধুতি আর ফতুয়া পরা হোটেলের মালিকটি বললেন, আমার পুরো নামটা স্যার কেউ আর বলে না। সবাই বলে, কান্তবাবু। বাবা এমন শক্ত নাম রেখেছিলেন!

ওঁর পিছনে একজন লম্বামতো ভদ্রলোক। তার হাতে একটা চিঠি। বাংলায় টাইপ করা সংক্ষিপ্ত চিঠি। কাকাবাবু সেটা পড়তে লাগলেন।

মান্যবর শ্রী রাজা রায়চৌধুরী মহাশয়,
আপনার নাম আমি অনেক শুনেছি। আপনি শ্রদ্ধেয় মানুষ। আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য আমি খুবই আগ্রহী। যদি এই গরিবের বাড়িতে একবার পদধূলি দেন, ধন্য বোধ করব। আমার নিজেরই আপনার কাছে যাওয়া উচিত ছিল। কিঞ্চিৎ অসুবিধের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। আমি আপনার অপেক্ষায় বসে থাকব। দুপুরে এই অধমের গৃহেই দুটি ডাল-ভাত খাবেন।
ইতি–
দীন আমির আলি

কাকাবাবু চিঠিটা নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, এই দীন আমির আলি কে?

জাভেদ বলল, আমির আলি? তিনিই তো এই শহরের এখন সবচেয়ে নামী লোক। বিরাট বড়লোক। একখানা বাড়ি যা বানিয়েছেন, আগেকার আমলের নবাবদের প্যালেসের মতো।

কাকাবাবু বললেন, চিঠিতে লিখেছেন, গরিবের বাড়ি। অধমের গৃহ। একেবারে বিনয়ের অবতার!

এলা বলল, উনি খুব ভাল মানুষ। সকলের সঙ্গে এত চমৎকার ব্যবহার করেন!

নাসের বলল, কাকাবাবু, আপনি যান, ওঁর সঙ্গে কথা বললে আপনার ভাল লাগবে। উনি বাঙালি নন। কিন্তু এত ভাল বাংলা শিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা মুখস্থ বলতে পারেন।

কাকাবাবু লম্বা লোকটিকে বললেন, ঠিক আছে। ওঁকে বলবেন, চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আমি পরে কোনও এক সময় যাওয়ার চেষ্টা করব।

লম্বা লোকটি বলল, স্যার, আমি ওঁর ম্যানেজার। আপনাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি গাড়ি এনেছি। উনি আপনাদের জন্য পথ চেয়ে বসে আছেন।

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, কেন। এখনই যেতে হবে কেন? আজ সকালে আমরা অন্য জায়গায় যাওয়ার প্ল্যান করে ফেলেছি।

ম্যানেজারটি হাত জোড় করে বলল, স্যার, আমির আলি সাহেব অসুস্থ, হার্ট অ্যাটাক হয়ে গিয়েছিল, উনি সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে পারেন না, তাই নিজে আসতে পারলেন না। যে-কোনও সময় ওঁকে আবার হাসপাতালে ভরতি করতে হতে পারে। তাই যদি এখনই একবার আসেন, আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

কান্তবাবু বললেন, একবার ঘুরে আসুন না স্যার। না হয় বেশিক্ষণ থাকবেন না।

কাকাবাবু জোজো আর সন্তুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, যাবি নাকি?

জোজো চিঠিখানা পড়ছিল, সে বলল, আমি মোটেই শুধু ডাল-ভাত খেতে চাই না!

সন্তু বলল, আগেই তোর খাওয়ার কথা!

কাকাবাবু বললেন, ওখানে বেশিক্ষণ থাকব না। আমি তা হলে পোশাক বদলে আসি।

নাসের বলল, আমরা উঠছি। বিকেলবেলা আসব আপনাদের নিয়ে যেতে।

কাকাবাবু বললেন, মিটিং-এ আমি যাচ্ছি না। দ্যাখো, যদি ওদের নিয়ে যেতে পারো!

হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ঝকঝকে নতুন গাড়ি। উর্দি-পরা ড্রাইভার।

কাকাবাবুরা তিনজন বসলেন পিছনে। সন্তু ফিসফিস করে জোজোকে বলল, বেশি বড়লোকদের বাড়িতে আমার কীরকম ভয়ভয় করে। কীরকম ব্যবহার করতে হবে বুঝি না। যদি কিছু ভুল হয়ে যায়!

জোজো ঠোঁট উলটে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, আরে দুর, কত বড়লোক আমি দেখেছি। খাম্বাজপুরের রাজবাড়ি দেখলে তোর চোখ ট্যারা হয়ে যেত। সে বাড়ি এত বড় যে, বাড়ির মধ্যে টয় ট্রেন চলে।

সন্তু বলল, তার মানে? বাড়ির মধ্যে ট্রেন চলে?

জোজো বলল, হ্যাঁ, বাড়ির মধ্যে উঠোনটা দশখানা ফুটবল মাঠের সমান। বসবার ঘর থেকে খাবার ঘর, কেউ হেঁটে যায় না। উঠোনে গিয়ে ছোট ট্রেনে উঠতে হয়। সে বাড়িতে গেলেই নতুন জুতো পরতে দেয়, আর হাতে লাগাতে হয় গ্লাভস, যাতে কোথাও ধুলো-ময়লা না লাগে। ট্রেনটাও চলে ইলেকট্রিকে, তাই ধোঁয়া হয় না।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, সেই খাম্বাজপুরটা কোথায়?

কাকাবাবু বললেন, বোধহয় গুলবাজপুরের পাশে, তাই না?

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, না, আপনি একটু ভুল বলেছেন কাকাবাবু, দুবরাজপুরের পাশে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, সে রাজবাড়িতে আর কী কী আছে?

জোজো বলল, আমরা যখন গিয়েছিলাম, তখন খুব গরমকাল। আকাশে মেঘ আছে, কিন্তু বৃষ্টির দেখা নেই। রাজার সভায় একজন ম্যাজিশিয়ান ছিলেন। ম্যাজিশিয়ান মানে সায়েন্টিস্ট। তিনি ইচ্ছে করলেই মেঘ থেকে বৃষ্টি নামাতে পারেন। আমাদের খুব গরমে কষ্ট হচ্ছে দেখে বিকেলবেলা সেই সায়েন্টিস্ট একটা ছোট্ট প্লেনে চেপে উপরে উঠে গেলেন। প্লেনটা মেঘের মধ্যে ঢুকে যেতেই ঝরঝর করে বৃষ্টি শুরু হল। আর সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ির চারদিকে মাইকে মেঘমল্লার গান বাজতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, বাঃ, ওরকম চমৎকার জায়গা দ্যাখার সুযোগ আমাদের কখনও হল না।

তারপর তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে ম্যানেজার ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের আমির আলি সাহেব কী করেন?

ম্যানেজার বললেন, উনি এখন আর কিছু করেন না। বয়স হয়েছে, শরীরও ভাল না। তবে লখনউতে ওঁদের খুব বড় ব্যাবসা আছে, উনি নিজেই সেই ব্যাবসাটা অনেকটা বাড়িয়েছেন। এখন বেশিরভাগ সময় এখানেই এসে থাকেন। স্যার, উনি গরিব- দুঃখীদের অনেক টাকা দান-ধ্যান করেন। কেউ যদি এসে বলে, টাকার অভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না, উনি বিয়ের সব খরচ দিয়ে দেন।

কাকাবাবু বললেন, আমাকে যে চিঠিটা দিলেন, সেটা কি উনি নিজে লিখেছেন!

ম্যানেজার বললেন, না, স্যার। উনি মুখে বলেছেন, আমরা টাইপ করেছি। এঁরা লখনউয়ের লোক, বাঙালি তো নন। তবে আলি সাহেব বাংলা বলতে পারেন, পড়তেও পারেন। লিখতে জানেন না এখনও।

খানিক পরে গাড়িটা এসে থামল এক জায়গায়। শহর ছাড়িয়ে কাটারা মসজিদের কাছাকাছি।

প্রথমে দেখা গেল একটা বেশ উঁচু সাদা রঙের গেট। তার উপরে কয়েকজন মানুষ বসতেও পারে। বোধহয় উৎসবের সময় বাজনদাররা ওখানে বসে সানাইটানাই বাজায়।

গেটের একদিকে পাথরের প্লেটে উর্দুতে কী যেন লেখা। আর-একদিকে ওরকমই পাথরের প্লেটে বাংলায় বড় বড় অক্ষরে লেখা, চেহেল সুতুন।

জোজো সেটা পড়ে বলল, এটা বাড়ির নাম? এর মানে কী?

কাকাবাবু সেই নামটার দিকে বেশ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, চেহেল সুতুন। এর মানে হচ্ছে চল্লিশটা থামওয়ালা বাড়ি। কী ম্যানেজারবাবু, তাই না?

ম্যানেজারবাবু বললেন, আজ্ঞে, আমি ঠিক বলতে পারব না। আমি এখানকার লোক, বাংলা ছাড়া অন্য কিছু জানি না।

কাকাবাবু আপন মনেই বললেন, এটা একটা বিশেষ বাড়ির নাম।

গেটের পাশে দুজন মিলিটারির মতো পোশাক পরা দরোয়ান। তারা স্যালুট করে লোহার দরজা খুলে দিল। গাড়িটা ঢুকে গেল ভিতরে।

দুপাশে বাগান, মাঝখান দিয়ে লাল সুরকির রাস্তা। আসল বাড়িটা অনেকটা ভিতরে। দূর থেকে খুব একটা বড় বাড়ি মনে হয় না। তবে বাগান অনেকখানি। এ বাড়ির রংও ধপধপে সাদা।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পর একটা বেশ চওড়া বারান্দা, আগাগোড়া মার্বেল পাথরের। সেই বারান্দার ওদিকে কয়েকটি ঘর।

বারান্দার এক কোণ থেকে দুটো মস্ত বড় কুকুর ছুটে এল এদিকে। জোজোর মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে, সে কাকাবাবুর গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

কুকুর দুটো কাছে আসবার আগেই একটা ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল। একজন মাথায় পাগড়ি-পরা লোক। সে শিস দিতেই কুকুর দুটো থেমে গেল।

কাকাবাবু বললেন, ভাল জাতের কুকুর। ডোবারম্যান। পাহারার ব্যবস্থা বেশ ভালই দেখছি।

পাগড়ি-পরা লোকটি বিনীতভাবে বলল, আসুন, এদিকে আসুন।

ঘরটির মধ্যে খয়েরি রঙের পুরু কার্পেট পাতা। প্রায় চোদ্দো-পনেরোটা সোফাসেট, অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোক একসঙ্গে বসতে পারে। উপরে ঝুলছে তিনখানা ঝাড়বাতি।

দরজার কাছে সবাইকে জুতো খুলতে হল। সেখানেই রাখা আছে অনেক ভেলভেটের চটি, বিভিন্ন পায়ের মাপের। নিজেদের মাপমতো পরতে হল সেই চটি।

সন্তু জোজোকে ফিসফিস করে বলল, এ তো তোর সেই বোম্বাগড়ের রাজবাড়ির মতো।

জোজো বলল, বোম্বাগড় নয়, খাম্বাজপুর। সেখানকার চটিগুলো আরও ভাল।

পাগড়ি-পরা লোকটি কাকাবাবুকে বলল, আপনার রিভলভারটা আমাকে দিন, যাওয়ার সময় আবার নিয়ে যাবেন।

কাকাবাবু লোকটির মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন। তারপর আপত্তি না জানিয়ে পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে দিয়ে দিলেন লোকটির হাতে।

একটা সোফায় কাকাবাবুর দুপাশে বসল জোজো আর সন্তু। এত বড় বাড়ি, কিন্তু ভিতরে কোনও লোকজনের সাড়া পাওয়া গেল না।

কাকাবাবু একটু ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন। লখনউয়ের ব্যবসায়ী, এখানে এত বড় বাড়ি বানিয়ে আছেন। কাকাবাবু তাকে চেনেন না, কোনওদিন দ্যাখেননি, তবু কাকাবাবুর সঙ্গে তার এমন কী জরুরি কথা থাকতে পারে?

অন্য দিকের দরজা দিয়ে একজন তোক একটা ট্রে হাতে নিয়ে ঢুকল। তিনটি লম্বা কাচের গেলাস, উপরে লেস দিয়ে ঢাকা, তার মধ্যে ঘন সাদা রঙের শরবত।

জোজো বলল, দুধ মনে হচ্ছে। আমি খাব না।

সন্তু একটা গেলাস নিয়ে চুমুক দিয়ে বলল, দুধ না। পেস্তা আর মালাই।

জোজো এবার দুচুমুকেই নিজের গেলাস শেষ করে বলল, মন্দ নয়। আর-এক গেলাস চাইলে দেবে?

কাকাবাবু বললেন, চাইলে হয়তো দেবে। কিন্তু চাইতে নেই। তুমি বরং আমারটা খাও।

জোজো বলল, না না। আমি সন্তুর সঙ্গে ইয়ারকি করছিলাম। আর খেতে চাই না।

আর-একজন লোক একটা বড় ট্রে ভরতি ফল নিয়ে এল। কমলা, বেদানা, কলা, আঙুর।

জোজো বলল, ধুত, ফল কে খাবে?

সন্তু বলল, আসছে, আসছে। এরপর কচুরি-শিঙাড়া।

জোজো বলল, সকালেই কচুরি খেয়েছি। শিঙাড়া ফিঙাড়াও এখন চলবে না।

সন্তু বলল, তারপর আসবে রেশমি কাবাব, রুমালি রুটি ...

ম্যানেজারবাবুটি একটা হুইল চেয়ার ঠেলে নিয়ে এলেন, সেই চেয়ারে বসে আছেন একজন খুব রোগা চেহারার বৃদ্ধ, সাদা পাজামা আর পাঞ্জাবি পরা, মাথার চুলও একেবারে সাদা। তার উপরে আবার একটা ছোট্ট সাদা টুপি।

বৃদ্ধটি হাত জোড় করেই আছেন, চেয়ারটি কাছে আসার পর তিনি পরিষ্কার বাংলায় বললেন, নমস্তে, নমস্তে রায়চৌধুরীবাবু। আপনি পদধূলি দিয়েছেন বলে আমি ধন্য হয়েছি। আপনার মতো মহান লোককে চাক্ষুষ করাও সৌভাগ্যের ব্যাপার।

বৃদ্ধ চেয়ার থেকে উঠে কাকাবাবুর হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম করতে এলেন।

কাকাবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, এ কী, এ কী, কী করছেন? না না, বসুন। আমি আপনার চেয়ে বয়সে ছোটই হব।

বৃদ্ধ বললেন, তাতে কী হয়েছে। মানুষ গুণে বড় হলে তাকেও প্রণাম করতে হয়। আপনাকে কত লোক চেনে, আমি তো একজন সামান্য মানুষ!

কাকাবাবু বললেন, কেউই সামান্য নয়, আমি সব মানুষকেই সমান মনে করি। তা ছাড়া আমি এমন কিছু গুণীও নই।

বৃদ্ধ বললেন, আমার নাম দীন আমির আলি। আমি লখনউয়ে থাকি।

কাকাবাবু বললেন, এখানে এত বড় বাড়ি বানিয়েছেন। তার মানে, আপনারা আসলে বাঙালি?

আমির আলি বললেন, আমরা সাত পুরুষের লখনউয়ের বাসিন্দা। তার মানে তো সেখানকারই লোক হলাম, তাই না? আমার বাবা-মা কেউ এক ফেঁটাও বাংলা জানতেন না।

তবে আপনি এত বাংলা শিখলেন কী করে?

আমি বাচ্চা বয়স থেকে উর্দু অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার অনুবাদ পড়তাম। খুব ভাল লাগত। তখনই মনে হত, যদি বাংলা শিখে মূল লেখা পড়ি, তা হলে নিশ্চয়ই আরও ভাল লাগবে। লখনউয়ে অনেক বাঙালি থাকে। আপনাদের অতুলপ্রসাদ সেনের নামে লখনউয়ে একটা রাস্তাও আছে। আমাদের বাড়ির কাছেই থাকতেন অমর সান্যাল, তিনি খুব ভাল গান গাইতেন, তার কাছে একটু একটু করে বাংলা শিখতে শুরু করি। বাংলা কী অপূর্ব সুমধুর ভাষা!

উর্দুও খুব মিষ্টি ভাষা! এখন তো আপনি চমৎকার বাংলা বলেন।

প্রথম প্রথম বাংলা বললে আমার বাড়ির লোক হাসত। আমার এক কাকা অবশ্য রাগ করে বলত, খবরদার, আমার সামনে বাংলা বলবি না। বাংলা তো হিন্দুদের ভাষা। একদম ভুল কথা। লখনউয়ে হিন্দুরাও তো উর্দু বলে। বাংলাদেশের মুসলমানরাও তো বাঙালি, তাই না?

তা তো ঠিকই!

সন্তু আর জোজো চোখাচোখি করল। এইসব কথা বলার জন্য এই বুড়ো লোকটি কাকাবাবুকে এখানে ডেকে এনেছেন? আসল কথাটা কী?

আমির আলি বললেন, এখন আমি রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ আরও অনেকের লেখা পড়ি। যখনই সময় পাই, বাংলা পড়তেই ভাল লাগে। এখন আমার গোস্ত-বিরিয়ানিও পছন্দ হয় না, মাছের ঝোল-ভাত খাই রোজ। ডাল আর বেগুনভাজাও। আমার রক্তেই বাঙালিআনা ঢুকে গেছে। হয়তো কোনও এক সময় আমার কোনও পূর্বপুরুষ বাঙালি ছিল।

কাকাবাবু বললেন, তা তো হতেই পারে! একসময় ভারতের অনেক জায়গা থেকে অনেক জাতের মানুষ এই বাংলায় এসে থেকে গিয়েছে। তেমনই অনেক বাঙালিও গিয়েছে দূর দূর দেশে। আপনি যেমন বললেন, লখনউয়ে অনেক বাঙালি আছে, তেমনই আছে রাজস্থানে, গোয়ায়, গুজরাতে?

আমির আলি বললেন, পাঁচ বছর আগে আমার প্রথম হার্টের অসুখ হয়। তার পরেই আমি একবার মুর্শিদাবাদ ঘুরতে এসেছিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার, এখানে এসে আমি অনেক সুস্থ বোধ করেছি। এখানকার জল-হাওয়া আমার শরীরের পক্ষে ভাল। তাই এখানে বাড়ি বানিয়েছি। লখনউ থেকে প্রায়ই এখানে চলে আসি। এখন আমার বাড়ির লোকেরাও কিছু কিছু বাংলা শিখে গিয়েছে।

কাকাবাবু খানিকটা অধৈর্য হয়ে বললেন, বাঃ খুব ভাল! আচ্ছা, এখন তবে উঠি? আমাদের অন্য জায়গায় যেতে হবে। আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম।

আমির আলি বললেন, সে কী! এখানে দুটি খেয়ে যাবেন না? সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে।

কাকাবাবু বললেন, না, খাওয়া হবে না। আমাদের কয়েকটা জায়গায় যাওয়ার কথা আছে। আমার ভাইপোরা আগে মুর্শিদাবাদে আসেনি।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন, আমির আলি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে।

তারপর ভাঙাভাঙা গলায় বললেন, রায়চৌধুরী সাহেব, আমি আপনাকে ডেকে আনিয়েছি ক্ষমা চাইবার জন্য। আপনি ক্ষমা না করলে আমি কিছুতেই শান্তি পাব না।

কাকাবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, ক্ষমা? হঠাৎ একথা বলছেন? কীসের জন্য ক্ষমা? আমি তো আপনাকে দেখিইনি কখনও।

আমির আলি বললেন, কাল সন্ধেবেলা গঙ্গার ধারে আপনার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে যাচ্ছিল। একটা ঘোড়া গিয়ে পড়ছিল আপনার গায়ে। ছি ছি ছি ছি। যদি আপনার কিছু হয়ে যেত, তা হলে কত বড় ক্ষতি হত দেশের। ইস, ভাবতেই পারছি না।

তারপর তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে ম্যানেজারকে বললেন, ওকে ডাকুন!

ম্যানেজার দৌড়ে বাড়ির ভিতরের দিকে গিয়ে একজনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। এ সেই কালকের সিনেমার নায়কের মতো যুবকটি।

আমির আলি বললেন, এ আমার ছোট ছেলে সেলিম। এই সেলিমই কাল ঘোড়া চালাচ্ছিল। নতুন শিখছে, সামলাতে পারেনি। কতবার ওকে বলেছি, এখানে কত বড় বাগান, তার মধ্যে আগে প্র্যাকটিস কর। তা না, ও বাইরে যাবেই যাবে?

কাকাবাবু বললেন, শুধু বাগানে ঘুরতে ভাল লাগবে কেন? রাস্তা দিয়ে। ছোটালে পুরোপুরি শেখা হয় না।

আমির আলি ছেলেকে বললেন, সেলিম, রায়চৌধুরী সাহেবকে কদমবুসি করো। মাপ চাও!

সেলিম ঘাড় শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল, মুখেও কিছু বলল না।

জোজো সন্তুর দিকে চেয়ে ভুরু নাচাল। অর্থাৎ সে জিজ্ঞেস করতে চাইল, কদমবুসি মানে কী রে?

সন্তু আলতোভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। অর্থাৎ সে নিজেও মানে জানে না।

সেলিমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাকাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, না না, ওসব দরকার নেই। ওসব আমি পছন্দ করি না। এই তো হাত মেলাচ্ছি।

কাকাবাবু সেলিমের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিতে সেও এক হাত বাড়িয়ে করমর্দন করল। কী যেন একটা বলল, তা বোঝা গেল না।

সেলিম আজকে পাক্কা সাহেবদের মতো সুট পরে আছে। দেখাচ্ছেও সাহেবদের মতো।

কাকাবাবু বললেন, আমিও একসময় খুব ঘোড়া চালিয়েছি। প্রথম প্রথম দু-একবার পড়েও গিয়েছি। ওরকম তো হয়ই!

কাকাবাবুর খোঁড়া পায়ের দিকে তাকিয়ে আমির আলি জিজ্ঞেস করলেন, সেই জন্যই কি আপনার একটা পা...

কাকাবাবু বললেন, না। এটা অন্য অ্যাক্সিডেন্ট।

আমির আলি বললেন, তা হলে আপনি আমাকে আর আমার ছেলেকে ক্ষমা করলেন তো?

কাকাবাবু বললেন, নিশ্চয়ই! ও ঘটনা আমি মনেও রাখব না। অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট।

তারপর হেসে ফেলে বললেন, আপনারা কি ভেবেছিলেন, আমি খুব রেগে আছি, রাগের চোটে আপনাকে বা আপনার ছেলেকে গুলি করে ফেলতে পারি? তাই ঢোকার মুখে আমার রিভলভারটা রেখে দেওয়া হল?

আমির আলি বললেন, আরে ছি ছি ছি ছি! তাই করেছে বুঝি? ওরা তো আপনাকে চেনে না। আসলে সিকিউরিটির জন্য এই বাড়ির মধ্যে কোনও অস্ত্র নিয়ে ঢোকা নিষেধ। এখনই ফেরত দিতে বলছি!

এর পরেও আমির আলি কাকাবাবুদের বিদায় নিতে দিলেন না। না খাইয়ে ছাড়বেন না কিছুতেই।

খাওয়ার ব্যবস্থা দেখে জোজো খুব খুশি।

আমির আলি সাহেব যতই বাঙালি খাবারের ভক্ত হয়ে থাকুন না কেন, এখানে কিন্তু শুধু ডাল-ভাত আর মাছ নয়, বিরিয়ানি, রোগন জুস, কোপ্তাকালিয়া, কিছুরই অভাব নেই। তিনি নিজে অবশ্য একটুখানি ভাত আর মুরগির সুপ খেলেন।

সেলিম অবশ্য খাবারের টেবিলে কাকাবাবুদের সঙ্গে যোগ দিল না। সে নাকি দুপুরে কিছুই খায় না, অনেক কিছু খায় রাত্তিরে।

এই দুপুর রোদ্দুরেও সে বাগানে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে। দেখা যাচ্ছে খাবার ঘরের জানলা দিয়ে। কাকাবাবু একটুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে আপন মনে বললেন, ভালই তো শিখেছে।

আমির আলি সন্তু আর জোজোর সঙ্গে একটাও কথা বলেননি। ওরাও তাই চুপচাপ। কিন্তু বেশিক্ষণ চুপচাপ থাকা জোজোর পক্ষে সম্ভব নয়।

সে খেতে খেতে একসময় ফস করে জিজ্ঞেস করল, সেলিম সাহেব কি সিনেমা করেন?

আমির আলি ভুরু কুঁচকে বললেন, সিনেমা?

জোজো বলল, দু-একটা হিন্দি সিনেমায় ওঁকে দেখেছি মনে হচ্ছে?

আমির আলি খানিকটা বিরক্তভাবে বললেন, না, বাজে কথা। আমরা খানদানি বংশের লোক। সিনেমা-থিয়েটার আমরা পছন্দ করি না। আমি জীবনে কোনও ফিল্ম বা নাটক দেখিনি। সেলিম ইঞ্জিনিয়ার। সে আমার ব্যাবসা দেখবে।

কাকাবাবু বললেন, আপনি বাংলা এত ভালবাসেন। আপনার ছেলেমেয়েরাও কি বাংলা বইটই পড়ে?

আমির আলি বললেন, আমার আরও দুই মেয়ে, এক ছেলে আছে। তারা বাংলা নিয়ে মাথা ঘামায় না। লখনউ ছেড়ে এখানে আসতেও চায় না। কিন্তু শুধু সেলিম মুর্শিদাবাদ খুব পছন্দ করে। প্রত্যেকবার আমার সঙ্গে আসে, অনেকদিন থেকে যায়। এখানে লোকজনদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে খানিকটা বাংলা শিখেছে। আপনি আমার এই ছেলেটিকে দোয়া করবেন।

কাকাবাবু বললেন, দয়া? না না, দয়া করবার কী আছে!

আমির আলি বললেন, দয়া না, দোয়া।

জোজো জিজ্ঞেস করল, দোয়া মানে?

আমির আলি বললেন, আশীর্বাদ।

কাকাবাবু বললেন, ও হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি ঠিক শুনতে পাইনি। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!

খুব বেশি খাওয়া হয়েছে, তাই হোটেলে ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেই হল। তা ছাড়া আজ হঠাৎ গরম পড়ে গিয়েছে, রোদ বেশ চড়া।

বিকেলের দিকে চা খেয়েই বেরিয়ে পড়া হল। এখন আকাশ আবার মেঘলা হয়ে এসেছে। গরমও কম।

গঙ্গার ঘাটে ফেরি নৌকোয় অনেকে এপার-ওপার যায়। কাকাবাবু একটা আলাদা নৌকো ভাড়া করলেন।

নদীতে এখন বেশি জল নেই। ওপারে পৌঁছোতেও বেশি সময় লাগল না, কারণ, নৌকোটা মেশিনে চলে। আগে বইঠার শব্দ হত ছপছপছপ, এখন শব্দ হয় ভট- ভটভট ।

এপারের ঘাটে খোশবাগের রাস্তা দেখানো আছে। নৌকো থেকে নামবার। পর জোজো জিজ্ঞেস করল, খোশবাগ মানে কী রে!

কাকাবাবু বললেন, জোজোর দেখছি সব কথায় মানে জানার খুব ইচ্ছে হয়েছে। সন্তু, বলতে পারবি?

সন্তু বলল, বাগ মানে তো বাগান। কলকাতায় বি-বা-দী বাগ, আজাদ হিন্দ বাগ। আর খোশ মানে...

কাকাবাবু বললেন, খোশ মানে খুশি। খুশির বাগান, সুন্দর বাগান। এটা আসলে একটা সমাধিস্থান। কিন্তু নানা ফুলের গাছটাছ দিয়ে খুব সুন্দরভাবে সাজানো। এটা বানিয়েছিলেন নবাব আলিবর্দি, তার মায়ের জন্য। তারপর তাকে এবং তার পরিবারের সকলকেই সমাধি দেওয়া হয় এখানে।

জোজো বলল, আমরা এটা দেখতে এসেছি কেন? সমাধিস্থানে তো দেখবার কিছু থাকে না। এর চেয়ে বরং সাহিত্যসভাটায় গেলে ভাল হত।

সন্তু বলল, তাজমহলও তো একটা সমাধিস্থান। সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক যায়।

জোজো তর্ক করার ঝোঁকে বলল, যাঃ, কী বলছিস! তাজমহলে কেউ সমাধি দেখতে যায় না। বাড়িখানাই কী চমৎকার, পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য। এই সমাধিস্থানটা মোটেই তেমন কিছু সুন্দর নয়।

কাকাবাবু বললেন, তা ঠিক, সমাধিস্থানে সত্যিই দেখার কিছু থাকে না। তবে, বিখ্যাত লোকের সমাধিস্থানে এলে সেইসব মানুষদের কথা মনে পড়ে। খানিকটা রোমাঞ্চ হয়। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের সমাধি আছে এখানে, তাই এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। তবে তোমার মতো যারা ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না, তাদের কাছে গুরুত্ব নেই। ঠিক আছে, আমরা এখানে। বেশিক্ষণ থাকব না।

সন্তু বলল, আমি ভাল করে দেখতে চাই।

পুরো সমাধিস্থানটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে ছড়িয়ে আছে অনেক সমাধি। একটা উঁচু জায়গায় পাশাপাশি রয়েছে বেশ কয়েকটি সমাধি।

সেখানে এসে কাকাবাবু একটা সাদা-কালো পাথরের সমাধি দেখিয়ে বললেন, এটাই নবাব আলিবর্দির।

সন্তু বলল, আর সিরাজের কোনটা?

কাকাবাবু আঙুল তুলে বললেন, ওই যে পুব দিকেরটা।

সন্তু সেখানে গিয়ে হাত জোড় করে নমস্কার জানাল। তার দেখাদেখি জোজোও পাশে দাঁড়িয়ে কপালে হাত ছুঁইয়ে একটা সেলাম ঠুকে দিল।

সিরাজের সমাধির পায়ের কাছে তাঁর বেগম লুতফুন্নেসার সমাধি। সেখানে একজন লোক সেই সমাধিতে মাথা ঠেকিয়ে চুপ করে বসে আছে।

কাকাবাবু বললেন, জোজো, তোমাদের একটা গল্প বলি। এই যে দেখছ, আলিবর্দির সমাধির উপরের পাথরটা ফাটা। এটা কেন হয়েছে জানো? পলাশির যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের কথা বিশ্বাস করে সিরাজ তার সৈন্যদের ফিরে আসার হুকুম দিল। সেই ভুলটা না করলে সিরাজ হয়তো যুদ্ধে জিতে যেতেও পারত। সমাধিস্থানের মধ্যে আলিবর্দি

সেই ভুলের কথা টের পেয়ে চিৎকার করে সিরাজকে বলতে চেয়েছিলেন, না না, সৈন্যদের ফিরিয়ো না। আলিবর্দি সমাধি থেকে উঠতে চেয়েছিলেন বলেই উপরটা ফেটে গিয়েছে!

জোজো বলল, যাঃ, একদম আজগুবি কথা! মানুষ মরে গেলে আবার কথা বলতে পারে নাকি?

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, আগেই তো বলেছি, গল্প! লোকে এইসব গল্প বানায়। শুনতে বেশ লাগে। তা বলে বিশ্বাস করার দরকার নেই। আমরা তো সকলে জানি ভূত বলে কিছু নেই। তা বলে ভূতের গল্প শুনলে কি গা ছমছম করে না?

সন্তু বলল, কাকাবাবু, ওই লোকটিকে দেখুন!

লুতফার সমাধিতে মাথা ঠেকিয়ে সেই লোকটি একইরকমভাবে বসে আছে। কাকাবাবু তাকে ভাল করে দেখে বললেন, তাই তো। আমির আলি সাহেবের ছোট ছেলে সেলিম। তোরা এখানে একটু অপেক্ষা কর। ওর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

তিনি সেলিমের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

সেলিম চোখ বুজে আছে, কিন্তু কাছাকাছি কোনও মানুষ এলে সবাই টের পায়। তা ছাড়া কাকাবাবুর ক্রাচে খটখট শব্দ হয়েছে।

সেলিম মুখ তুলে তাকাতেই কাকাবাবু বললেন, আসসালাম আলাইকুম সেলিম সাহেব।

সেলিম বেশ বিরক্তভাবে বলল, আলাইকুম আসসালাম।

কাকাবাবু বললেন, তোমাকে বিরক্ত করতে চাই না, শুধু একটা প্রশ্ন করব?

সেলিম কড়া গলায় বলল, আমাকে তুমি বলার পারমিশন আপনাকে কে দিয়েছে? আপনি আমাকে কতদিন চেনেন?

কাকাবাবু থতমত খেয়ে বললেন, দুঃখিত, দুঃখিত। আমাদের এদিকে বয়স খুব ছোট হলে তুমিই বলে ফেলি। দুঃখিত। আমি আবার বলছি, আপনাকে একটা সোজাসুজি প্রশ্ন করতে পারি?

সেলিম বলল, গো অ্যাহেড!

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, গতকাল গঙ্গার ধারে আপনি কি ইচ্ছে করে আমার দিকে ঘোড়াটা চালিয়ে দিয়েছিলেন?

সেলিম বলল, ইয়েস!

কাকাবাবু বললেন, আমিও তাই বুঝেছি। সত্যি কথাটা বলার জন্য ধন্যবাদ। তা হলে আর-একটা সত্যি কথা জিজ্ঞেস করি, কেন? আপনি কি আমাকে চেনেন? আমি কি আপনার সঙ্গে কখনও শত্রুতা করেছি?

সেলিম বলল, না। আপনাকে চিনি না। শত্রুতার প্রশ্নই ওঠে না।

তা হলে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন কেন?

নো। মেরে ফেলতে তো চাইনি। আই ওয়ান্টেড, ঘোড়ার পায়ের ধাক্কা লেগে আপনি আহত হবেন, কয়েকটা দিন হাসপাতালে থাকবেন, দ্যাটস অল!

সে কী! আপনি আমাকে চেনেন না, কোনও শত্রুতাও নেই। তবু আমাকে আহত করে হাসপাতালে পাঠাতে চাইবেন কেন?

তার কারণ, কয়েকজন লোক আমাকে জানিয়েছে, ইউ আর আ ট্রাবলসাম ম্যান। আপনি অন্য লোকদের ব্যাপারে নাক গলান। অন্য লোকের কাজে বাধার সৃষ্টি করেন। আমরা একটা কাজ করতে যাচ্ছি, সেই জন্যই কিছুদিন আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে রাখা দরকার।

ভারী আশ্চর্য ব্যাপার। আজ সকালের আগে আমিও আপনাদের চিনতাম। আপনারা কী কাজ করতে যাচ্ছেন, সে সম্পর্কেও আমার কোনও ধারণাই নেই। আপনাদের ব্যাপারে আমি মাথা গলাব কী করে? আপনি সত্যি কথা বলছেন বলেই জিজ্ঞেস করছি, আপনারা কী কাজ করতে যাচ্ছেন?

একজন মানুষকে খুন করা হবে।

কাকাবাবু সহজে অবাক হওয়ার ভাব দেখান না। কিন্তু সেলিম এমন ঠান্ডা মাথায় কথাটা বলল যে, তিনি কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, খুন করবেন?

সেলিম একইরকমভাবে বলল, ইয়েস, খুন করা হবে। কোনও প্রমাণ থাকবে না।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কাকে?

সেলিম এবার চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আমি কি এতই বোকা যে, সে নামটা আপনাকে জানিয়ে দেব?

কাকাবাবু বললেন, তা ঠিক। কিন্তু কেন খুন করবেন, তা জানতে পারি কি?

সেলিম বলল, সেটাই বা আপনাকে জানাতে যাব কেন? এটা আমার প্রাইভেট ব্যাপার।

কাকাবাবু বললেন, বেশ। আপনারা আমাকে আহত করে হাসপাতালে পাঠাতে চেয়েছিলেন। সেটা হয়নি। আমি দিব্যি বহাল তবিয়তে আছি। এরপর আর ওরকম চেষ্টা করলেও পারবেন না। আমি সাবধান হয়ে যাব। আপনারা যে ভেবেছিলেন, অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো আমার অভ্যেস, যদি সত্যিই এবার নাক গলাই?

সেলিম বলল, আপনারা মুর্শিদাবাদ বেড়াতে এসেছেন। আজ সন্ধের মধ্যে যতটা পারেন দেখে নিন। কাল সকালেই এ-জায়গা ছেড়ে চলে যান। সেটাই আপনাদের পক্ষে ভাল হবে।

কাকাবাবু এবার হেসে ফেলে বললেন, চলে যাব? তাই নাকি? আমি কোথায় থাকব কিংবা থাকব না, সেটা অন্য কেউ ঠিক করে দেবে? এরকম তো কখনও হয়নি। আমি এখানে আরও তিন-চারদিন থাকব ঠিক করেছি।

সেলিম বলল, আপনার প্ল্যান চেঞ্জ করুন। কাল না ফিরে গেলে আর কোনওদিনই ফিরতে পারবেন না এখান থেকে।

কাকাবাবু বললেন, এটা একটা চ্যালেঞ্জ? সেলিম বলল, ইয়েস। চ্যালেঞ্জ!

কাকাবাবু বললেন, আমি চ্যালেঞ্জ নিতে ভালবাসি। ঠিক আছে, দেখা যাক।

তিনি ফিরে এলেন সন্তুদের কাছে।

সন্তু বলল, ওদের বাড়িতে সেলিম তো কোনও কথাই বলেনি। এখানে এত কথা কী বলছিল?

কাকাবাবু বললেন, সে তোরা পরে শুনবি।

তারপর আপন মনে বললেন, এমনও হতে পারে, ছেলেটা পাগল। তবে পাগলরাও এক-এক সময় খুব বিপজ্জনক হয়।

ওঁদের নৌকোটা অপেক্ষা করছিল, কাকাবাবুরা উঠে পড়ার পর আবার ভটভট শুরু হল। একটুখানি যাওয়ার পর নৌকোর মাঝিটি বলল, বাবা, আমাদের বাড়ি এই পাশের গাঁয়ে। সেখানে একটু থামব। আমার বউকে কয়েকটা টাকা দিয়ে আসতে হবে, চাল কিনবে।

কাকাবাবু বললেন, তোমার গ্রামের নাম কী? সে বলল, রহিমপুর। বেশিক্ষণ লাগবে না। যাব আর আসব।

কাকাবাবু বললেন, ঠিক আছে, চলো!

নৌকোটা যখন মাঝনদী থেকে ঘাটের দিকে এগোচ্ছে, তখন কিছু লোকের হইচই শোনা গেল। তারা যেন কিছু একটা ভয়ে চাচাচ্ছে।

আর-একটু যেতেই শোনা গেল, লোকেরা বলছে, কুমির! কুমির! ধনাকে কুমিরে নিয়ে গেল!

খানিকটা গভীর জলে দেখা গেল, একটি ছেলে খাবি খাচ্ছে। সে একবার জলের উপর একটা হাত তুলছে, একবার ডুবে যাচ্ছে।

জোজো বলল, ওই ছেলেটাকে কুমিরে ধরেছে নাকি! কী হবে?

তখনই ঝপ করে একটা শব্দ শুনে সকলে আবার চমকে ফিরে তাকাল।

সন্তু জলে ঝাঁপ দিয়েছে।

জোজো দারুণ ভয় পেয়ে বলল, কাকাবাবু, সন্তু, সন্তু... ওকে কুমিরে খেয়ে ফেলবে... কী হবে?

কাকাবাবু কিছু না বলে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন। পকেটে হাত দিয়ে রিভলভারটা ছুঁলেন একবার। কিন্তু রিভলভার দিয়ে তো কুমির মারা যায় না!

সন্তু ডুবন্ত ছেলেটার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে জোরে জোরে সাঁতার কেটে।

কাকাবাবু মাঝিকে বললেন, ওদের পাশে নিয়ে চলো।

তিনি জুতো খুলতে লাগলেন। তৈরি হলেন নিজেও জলে লাফ দেওয়ার জন্য।

সন্তু সেই ছেলেটির হাত ধরল, তারপর দুজনেই ডুবে গেল।

কাকাবাবু ঝাঁপ দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন, তখনই সন্তু আবার মাথা তুলে বলল, ঠিক আছে।

জোজো ফ্যাকাশে মুখে বলল, ঠিক আছে মানে কী? কুমিরটা কোথায়?

কাকাবাবু দাঁড়িয়েই ছিলেন।

সন্তু আরও কয়েকবার ডুবে গেল, আবার উঠল। তারপর ছেলেটিকে নিজের বুকের উপর রেখে চিতসাঁতার কেটে এগিয়ে এল নৌকোর দিকে।

ঘাটের লোকেরা তখনও চিৎকার করছে।

কাকাবাবু আর মাঝি দুজনে মিলে টেনে তুলল সন্তু আর ছেলেটিকে।

সন্তু বলল, কুমিরটুমির কিছু নেই। ছেলেটা এমনিই ডুবে যাচ্ছিল।

ছেলেটির মুখোনা ভয়ে ছাই রঙের হয়ে গিয়েছে। কথাই বলতে পারছে। কোনওরকমে কয়েকবার দম নিয়ে বলল, আমার পায়ে কামড়ে দিয়েছিল।

কাকাবাবু বললেন, তোমার কোনও পায়ে তো দাগ নেই। রক্তও বেরোয়নি!

সন্তু বলল, হয়তো কিছুতে ঠোক্কর মেরেছে। বড় মাছটাছ হতে পারে! তাতেই ভয় পেয়ে ও সাঁতার ভুলে গেছে!

মাঝিটি বলল, এ নদীতে তো কুমির নাই। কত মানুষ সাঁতরায়। কোনওদিন দেখি নাই কুমির। একবার একটা-দুটো শুশুক এসেছিল।

কাকাবাবু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, কুমির নাই, তো আগে বলোনি কেন? গ্রামের লোকরাই বা কুমির কুমির বলে অযথা চাচাচ্ছে কেন? কেউ ছেলেটাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেনি!

মাঝিটা মুগ্ধভাবে সন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, এই ছেলেবাবুটির তো ভারী সাহস!

সন্তু নিজের গায়ের জামা নিংড়োতে নিংড়োতে বলল, এতে এমন কিছু সাহস লাগে না।

মাঝি বলল, কুমির নাই, কিন্তু হঠাৎ তো আসতেই পারে। বর্ষার সময় কোনওবার তো পুকুরেও কুমির আসে।

জোজো বলল, যদি সত্যি কুমির হত, তা হলে কী করতিস?

সন্তু বলল, অত ভাবলে চলে না। আর দেরি হলে ছেলেটা ডুবে যেত!

ঘাটের লোকরা সকলে এখন চুপ। তারা হাঁ করে এই নৌকোর মানুষদের দেখছে।

ধনা নামের ছেলেটা নৌকো থেকে নেমেই একজন মহিলাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল।

কাকাবাবু বললেন, নৌকোটা অন্য একটা জায়গায় নিয়ে চলো। এখানে থাকলে এই লোকরা অনেক কথা বলবে। আমাদের নামিয়ে খাতির করতে চাইবে। ওসব দরকার নেই।

মাঝিটি নৌকো চালিয়ে দিয়ে কাচুমাচুভাবে বলল, আমার বাড়িতে যাব না?

কাকাবাবু বললেন, যাবে, নিশ্চয়ই যাবে। আর-একটু দূরে গিয়ে নামো। তোমার জন্যই তো ছেলেটি বেঁচে গেল।

মাঝিটি বলল, কী যে বলেন বাবু! এই ছেলেবাবুটিই তো অসাধ্যসাধন করল।

কাকাবাবু বললেন, তুমি গ্রামের বাড়িতে যাবে বলেই তো আমরা এদিকে এলাম। মাঝনদীতে থাকলে এদিককার চেঁচামেচি শুনতেও পেতাম না, ছেলেটির ডুবে যাওয়ার ব্যাপারটা জানতেও পারতাম না।

কাকাবাবু সন্তুর প্রশংসা করলেন না। শুধু তার ভিজে চুলে একবার আদরের হাত বুলিয়ে দিলেন।

পকেট থেকে একশো টাকার একটা নোট বের করে মাঝিটিকে বললেন, এটা তোমার বউকে দিয়ে বলো, শুধু যেন চাল না কিনে আজ তোমাদের বাড়িতে মাছ-মাংসও রান্না হয়!

তাঁর মনের মধ্যে একটা কথা ঘুরতে লাগল। সন্তু নিঃস্বার্থভাবে, নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও একটি ছেলেকে বাঁচাল। আর সেলিম ঠান্ডা মাথায় একজন মানুষকে খুন করতে চায়। কত রকম মানুষ আছে এই পৃথিবীতে।

আজ আর অন্য কোথাও যাওয়া হবে না। সন্তুর ভিজে জামাকাপড়ই আগে পালটানো দরকার।

মাঝিটি ফিরে আসার পর যাওয়া হল হোটেলে।

সেখানে নাসের নামের ছেলেটি বাইরে বসে আছে। ওদের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেলেও কাকাবাবুদের সে সেখানে নিয়ে যাবেই যাবে।

অগত্যা যেতেই হল। কিন্তু কাকাবাবু কিছুতেই মঞ্চে উঠতে কিংবা বক্তৃতা দিতে রাজি হলেন না। পিছন দিকে বসে সব শুনতে লাগলেন। অনেকে। নিজেদের কবিতা পাঠ করছে, কেউ কেউ আবৃত্তি করল অন্যদের কবিতা। একজন মাঝবয়সি লোক একখানা জ্বালাময়ী বক্তৃতাও দিয়ে ফেলল, কিন্তু কার বিরুদ্ধে যে তার রাগ, তা কাকাবাবু বুঝতে পারলেন না।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইন্দ্রজিৎ দত্ত এলেন একেবারে শেষের দিকে।

তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বসিয়ে দেওয়া হল মঞ্চে। তিনি জরুরি কাজে আটকে পড়েছিলেন বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর দর্শকদের মধ্যে কাকাবাবুকে দেখতে পেয়ে হাতছানি দিয়ে ডেকে বললেন, কাকাবাবু, আপনি আসুন, আপনার অভিজ্ঞতার কথা সবাই শুনতে চায়।

কাকাবাবু হাত নেড়ে জানালেন, তিনি যাবেন না। তার মাথার মধ্যে ঘুরছে। শুধু সেলিমের কথা। সে একজনকে খুন করবে। সে কাকে খুন করতে চায়, সেটা না জানলে তিনি লোকটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন কী করে? সেলিম কি আজ রাতেই কাজটা সেরে ফেলতে চায়? বোধহয় না। সে কাল সকাল পর্যন্ত সময় দিয়েছে তাঁকে এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য।

অনুষ্ঠান শেষে ইন্দ্রজিৎ দত্ত কাকাবাবুর সঙ্গে হোটেলে এলেন আড্ডা দিতে।

প্রথমেই তিনি বললেন, কাকাবাবু, বহরমপুরের মিটিং-এ আপনি মূর্তিগুলো সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তাই-ই মিলে গেছে। বড় অষ্টধাতুর বিষ্ণু মূর্তিটা পাল আমলের। অন্য দুটো অত পুরনো নয়। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ি থেকে একসময় চুরি গিয়েছিল। কলকাতার পণ্ডিতরাও সেই মত দিয়েছেন।

কাকাবাবু বললেন, যাক, তা হলে আর আমার কোনও দায়িত্ব রইল না।

ইন্দ্রজিৎ জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের মুর্শিদাবাদ বেড়ানো কেমন হচ্ছে?

কাকাবাবু বললেন, ওদের জিজ্ঞেস করো। জোজো ঠোঁট উলটে বলল, এমন কিছু দেখবার নেই। সবই তো ভাঙাচোরা বাড়ি!

ইন্দ্রজিৎ বললেন, তা ঠিক। হিরাঝিল, মোতিঝিল, এইসব দারুণ দারুণ বাড়ি কিছুই নেই। আশ্চর্য ব্যাপার, নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ নাকি লন্ডনের মতন ছিল, এখন তা

একেবারেই বোঝা যায় না। প্রায় সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এখন লোকে এই হাজারদুয়ারি আর কাটরার মসজিদই শুধু দেখতে যায়।

সন্তু বলল, জোজোর হাজারদুয়ারি পছন্দ হয়নি। ও আরও বড় বড় সব রাজবাড়ি দেখেছে। আমার কিন্তু ভাল লেগেছে খুব।

কাকাবাবু বললেন, এখানে আমির আলির নতুন বাড়িটাও দেখবার মতো। আচ্ছা, লখনউয়ের ব্যবসায়ী এখানে এসে অত বড় বাড়ি বানালেন কেন?

ইন্দ্রজিৎ বললেন, শুনেছি তো এই জায়গাটা ওঁর খুব পছন্দ। ভদ্রলোক খুব দান-ধ্যান করেন। এখানকার মানুষ ওঁকে খুব পছন্দ করে।

কাকাবাবু বললেন, আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সত্যিই ভাল লোক। ওঁর এক ছেলে সেলিমও এখানেই বেশিরভাগ থাকে।

ইন্দ্রজিৎ বললেন, হ্যাঁ, সেও অতি ভদ্র। সকলের সঙ্গে বিনীত ব্যবহার করে। আজ পর্যন্ত কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে বলে শোনা যায়নি।

জোজো বলল, তা হতে পারে। কিন্তু ও লোকটা কাকাবাবুর কাছে ক্ষমা চায়নি।

ইন্দ্রজিৎ অবাক হয়ে বললেন, তার মানে? ক্ষমা চাইবার মতো কী কাজ করেছে সেলিম?

কাকাবাবু বললেন, সে কিছু না। অতি সামান্য ব্যাপার। জোজো, আমরা বলেছি না, ওটা আমরা ভুলে যাব?

ইন্দ্রজিৎ বললেন, ও কাকাবাবু, আপনি তো এখানে এসেই একটা দারুণ কাজ করে ফেলেছেন।

এবার কাকাবাবুর অবাক হওয়ার পালা। তিনি বললেন, আমি আবার কী দারুণ কাজ করলাম?

ইন্দ্রজিৎ বললেন, আপনি পুলিশকে খুব সাহায্য করেছেন।

কাকাবাবু আবার বললেন, পুলিশকে সাহায্য করেছি? কই, কিছু তো করিনি!

ইন্দ্রজিৎ বললেন, জাভেদ নামে একজন ইনস্পেক্টর এসেছিল, আপনি তাকে একটা টিপস দিয়েছেন, তাতেই তো মহম্মদি বেগের ছুরিটা উদ্ধার করা গেল।

কাকাবাবু বললেন, তাই নাকি?

ইন্দ্রজিৎ বললেন, ওটা চুরি যাওয়ার ঠিক আগে হাজারদুয়ারির সামনে একটা যাত্রাপার্টি এসে নানারকম বাজনা বাজিয়ে লড়াই-লড়াই খেলা দেখাচ্ছিল। আপনি সেই যাত্রাপার্টির খোঁজ নিতে বলেছিলেন। তাদের খোঁজ পেতেই সব ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেল। সেই যাত্রাপার্টির লোকরা স্বীকার করেছে যে, কোনও একজন লোক তাদের বলেছিল, ঠিক ওই সময় ওই জায়গায় গিয়ে খেলাটা দেখাতে। ওই খেলা দেখার জন্য সকলে ভিড় করেছিল, হাজারদুয়ারির গার্ডরাও উঁকিঝুঁকি মারছিল, সেই সুযোগে চোর ওই ছুরিটা সরিয়ে ফেলে। সেই সূত্র ধরে কে টাকা দিয়েছিল, তাও জানা গেল। সেই লোকটা বলল, তাকে টাকা দিয়েছে অন্য একজন।

কাকাবাবু বললেন, চোর ধরা পড়েছে শেষ পর্যন্ত?

ইন্দ্রজিৎ বললেন, পুলিশ খুব ভাল কাজ করেছে, তবু একটু দেরি করে ফেলেছে। মূল টাকাটা যে দিয়েছিল, পুলিশ তার বাড়িতেও পৌঁছে গেল। সে বাড়িতে শুধু একজন কাজের লোক ছিল। সে বলল, পুলিশ আসার কিছুক্ষণ আগেই তিনজন লোক তার মালিকের কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে ধরে নিয়ে গেছে। সে বাড়ি সার্চ করে অবশ্য ছুরিটা পাওয়া গিয়েছে।

কাকাবাবু বললেন, সামান্য একটা ছুরির জন্য এত কাণ্ড! কেন?

ইন্দ্রজিৎ বললেন, সেটা নিশ্চয়ই জানা যাবে। কারা ওকে ধরে নিয়ে গেল, সেটাও দেখতে হবে।

কাকাবাবু বললেন, সেই লোকটি কে? ইন্দ্রজিৎ বললেন, তার নাম ফিরোজ শাহ। হিন্দু না মুসলমান তা বোঝা যাচ্ছে না। এই ফিরোজ বেশির ভাগ সময় থাকে লন্ডনে। ওখানে ব্যাবসা করে। ও নাকি এখানকারই কোনও মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। তাই আসে মাঝে মাঝে। ওর এক আত্মীয়ের একটা বাড়ি আছে এখানে। সেই আত্মীয়ও এখন বেঁচে নেই। একজন কাজের লোক নিয়ে একা থাকে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, ছুরিটা চুরি করতে গেল কেন?

ইন্দ্রজিৎ বললেন, সে তো ওকে জেরা না করলে জানা যাবে না। তবে অন্য লোকটি বলেছে, ওর নাকি নানা দেশের ছুরি জমানোর শখ। যারা ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, তারা কিন্তু ছুরিটা নেয়নি, কিছুই নেয়নি। বোধহয় ওরা অপহরণ করেছে টাকার জন্য। এরকম তো প্রায়ই ব্যবসায়ীদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

জোজো বলল, অ্যাবডাকশন! এরপর টাকা চাইবে। কিন্তু চাইবে কার কাছে? ওর তো বাড়িতে একজন কাজের লোক ছাড়া আর কেউ নেই বললেন?

ইন্দ্রজিৎ বললেন, সেটাও ঠিক। দেখা যাক। পুলিশ এর মধ্যে তল্লাশি শুরু করেছে।

কাকাবাবু বললেন, ছুরিটা এখন কোথায়? থানায়? খুব সাবধানে রাখতে বলো। হয়তো এর মধ্যে অন্য কোনও ব্যাপার আছে!

কিছুক্ষণ পর খাবারের ডাক পড়ল।

আজ শুধু দুরকমের মাছ আর মিষ্টি দই। এ হোটেলের রান্না বেশ ভাল।

এখন হোটেলে বেশি লোক নেই, দোতলাটা প্রায় ফাঁকা। কাকাবাবুরা দুটো ঘর নিয়েছেন। সন্তুদের পাশের দুটো ঘর তালাবন্ধ।

খাওয়ার পর সন্তু আর জোজো বলল, ওরা একটু ঘুরে আসবে। রাত্তিরবেলা। হাজারদুয়ারি কেমন দেখায়, ওরা দেখতে চায়।

কাকাবাবু আপত্তি করলেন না। শুধু বললেন, একটু সাবধানে, চোখকান খোলা রাখিস। তোদের যদি কেউ অপহরণ করে, তা হলে টাকা চাইলে আমি তো দিতে পারব না। অত টাকা পাব কোথায়?

জোজো বলল, আমাদের যদি কেউ অপহরণ করে, তবে তার কপালে দুঃখ আছে।

কাকাবাবু হাসলেন, এটা জোজো ঠিকই বলেছে।

ওরা চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু একা বসে রইলেন বারান্দায়।

একটু পরেই তিনি ঘোড়ার খুরের শব্দ পেলেন। সেলিম আজও ঘোড়া ছোটাচ্ছে? আর তো কাউকে ঘোড়া চালাতে দেখা যায়নি এখানে। ঘোড়াটা অবশ্য থামল না।

কাকাবাবুর মাথায় ঘুরছে সেলিমের কথা। অত বড় লোকের ছেলে, সকলে তাকে ভদ্র, ভাল ছেলে বলে জানে। অথচ সে একটা মানুষ খুন করতে চাইছে। কেন? সেটা কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না।

ইন্দ্রজিৎকে এই কথা জানিয়ে কোনও লাভ হত না। একটা খুন হলে তারপর পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু খুন হওয়ার আগে তা নিয়ে পুলিশ মাথা ঘামাবে কেন? কত লোকই তো বলতে পারে, আমি অমুককে খুন করব। কিন্তু সত্যি সত্যি কজন খুন করে? সেলিমকে সবাই পছন্দ করে, শুধু শুধু পুলিশ তার উপরে নজরও রাখবে না।

সন্তুরা ফিরে এল ঘণ্টাখানেক পরে। দুজনেই ফুর্তিতে আছে বেশ।

আর-একটু গল্প করার পর কাকাবাবু বললেন, এবার তোরা শুয়ে পড়। কাল সকালে বেরিয়ে বাকি জায়গাগুলো দেখে নিতে হবে।

কাকাবাবু নিজের ঘরে এসে দরজা লক করে দিলেন। দরজাটা বেশ মজবুত, বাইরে থেকে খোলা যাবে না।

এ ঘরের তিনটে জানলা। তিনি সব জানলা বন্ধ করে ঘুমোতে পারেন না। প্রত্যেকটা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দেখলেন, একটা জানলার কাছে একটা গাছ আছে। অন্য দুটো জানলার কাছাকাছি কিছু নেই, একেবারে ফাঁকা। তিনি শুধু গাছের কাছের জানলাটা বন্ধ রাখলেন।

রিভলভারটা রাখলেন বালিশের নীচে। একটু পরেই তার ঘুম এসে গেল।

কাকাবাবুর ঘুম খুব পাতলা। সামান্য শব্দেই ঘুম ভেঙে যায়। একসময় ধুপ করে একটা শব্দ হতেই তিনি ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

কোনও একটা জানলা দিয়ে একটা গোলমতন জিনিস এসে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। অভ্যেসবশত কাকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারটা হাতে নিয়ে জানলা দুটোর দিকে তাকালেন। সেখানে কেউ নেই।

গোলমতো জিনিসটা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে! কাকাবাবু খাট থেকে নেমে এসে সোজা জিনিসটার কাছে এলেন। বোমা নাকি? ক্রমশ ধোঁয়া বাড়ছে। বোমা হোক আর যাই হোক, এটাকে এক্ষুনি ফেলে দিতে হবে। রিভলভারটা পকেটে রেখে তিনি জিনিসটা তুলতে গেলেন।

তখনই তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। পা দুটো দুমড়ে বসে পড়লেন মাটিতে। তিনি বুঝতে পারলেন, এটা ক্লোরোফর্মের ধোঁয়া। আর বেশিক্ষণ তিনি সজ্ঞানে থাকতে পারবেন না।

খুট করে শব্দ হল, কেউ চাবি দিয়ে খুলে ফেলল দরজা। ছায়ামূর্তির মতন তিনজন মানুষ ঢুকল ঘরে। কাকাবাবু দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু উঠে দাঁড়াতে পারছেন না। ওই গোল জিনিসটা তুলে ওদের দিকে ছুড়ে মারতে চাইলেন। কিন্তু হাত অবশ হয়ে গেছে। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে।

৪. প্রত্যেকদিন কাকাবাবুই আগে জেগে ওঠেন

প্রত্যেকদিন কাকাবাবুই আগে জেগে ওঠেন। আজ সন্তু আর জোজো সকালবেলা বাইরে বেরিয়ে দেখল, কাকাবাবুর ঘরের দরজা বন্ধ।

কচুরি আর জিলিপি কিনতে বেরিয়ে গেল দুজনে। দোকানটা একটু দূরে, সেখানে গরম গরম জিলিপি ভাজা হচ্ছে। দোকানেই বসে ওরা খেয়ে নিল ভাল করে, তারপর কাকাবাবুর জন্যে কিনে নিয়ে ফিরে এল।

কাকাবাবুর ঘরের দরজা তখনও বন্ধ।

এত বেলা পর্যন্ত কখনও ঘুমোন না কাকাবাবু। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। একটু ইতস্তত করে সন্তু দুবার ধাক্কা দিল দরজায়, আলতো করে।

কোনও সাড়া নেই।

সন্তুর ভুরু কুঁচকে গেল। সামান্য শব্দে কাকাবাবুর ঘুম ভেঙে যায়। তবে কি তিনি বাথরুমে গিয়েছেন?

একটুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার দরজায় ধাক্কা দিল সন্তু। এবার একটু জোরে জোজো ডেকে উঠল, কাকাবাবু, কাকাবাবু!

তবুও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

আরও কয়েকবার দুমদুম করা হল। কাকাবাবু বাথরুমে থাকলেও এ আওয়াজ শুনতে পাওয়ার কথা। তা হলে কি কাকাবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?

হোটেলের সব ঘরেরই একটা ডুপ্লিকেট চাবি থাকে ম্যানেজারের কাছে। এ হোটেলের যিনি মালিক, তিনিই ম্যানেজার। সেই কান্তবাবু থাকেন পাশের বাড়িতে।

তাকে খবর দেওয়া হল। তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বললেন, কী ব্যাপার? রায়চৌধুরীবাবুর কী হয়েছে?

সন্তু বলল, কী হয়েছে, তা তো বোঝা যাচ্ছে না। কোনও সাড়াই পাওয়া যাচ্ছে না।

কান্তবাবু বললেন, ভিতর থেকে বন্ধ। ঘরেই আছেন নিশ্চয়ই।

সন্তু বলল, আপনার কাছে তো আর-একটা চাবি আছে?

কান্তবাবু জিভ কেটে বললেন, এই রে! আমার কাছে তো চাবি নেই। হয়েছে কী, এক মাস আগে এই সাত নম্বর ঘরে যে লোকটা ছিলেন, তিনি যাওয়ার সময় চাবিটা নিয়ে চলে গেছেন, ফেরত দিতে ভুলে গেছেন আর কী? এই এক মুশকিল, হোটেলের খদ্দেররা অনেকেই চাবি পকেটে নিয়ে চলে যায়। এ চাবির তো আর ডুপ্লিকেট করা হয়নি!

সন্তু বলল, তা হলে দরজা ভাঙতে হবে।

কান্তবাবু বললেন, দরজা ভাঙতে হবে? আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে হয় না?

সন্তু দৃঢ়ভাবে বলল, না। উনি যদি অসুস্থ হয়ে থাকেন, তা হলে এখনই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার।

কান্তবাবু বললেন, তা হলে, তা হলে, মানে, দরজা ভাঙতে গেলে তো আগে পুলিশে খবর দিতে হয়। পুলিশকে সাক্ষী রাখা দরকার।

জোজো বলল, পুলিশ ডাকতে ডাকতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। এখনই দরজা ভাঙুন!

সে নিজেই দড়াম করে এক লাথি মারল দরজায়।

কান্তবাবু আঁতকে উঠে বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও ভাই, অমন করলে দরজাটা নষ্ট হয়ে যাবে। বরং তালাটা যদি ভাঙা যায়...

একজন বেয়ারাকে ডাকা হল। সে একটা স্ক্রু ডাইভার এনে কিছুক্ষণ খোঁচাখুঁচি করার পর নষ্ট হয়ে গেল তালাটা। খুলে গেল দরজা।

সকলে ঢুকে পড়ল একসঙ্গে। বিছানা ফাকা। ঘরে কেউ নেই, বাথরুমের দরজাও খোলা।

কান্তবাবু খাটের তলায় উঁকিঝুঁকি মেরে বললেন, এখানেও তো নেই। কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ছিল, অথচ মানুষটা উধাও হয়ে যায় কী করে? কী অদ্ভুত কাণ্ড! এরকম কখনও দেখিনি, শুনিনি!

সন্তু দেখল, কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো পড়ে আছে। চটি জোড়াও রয়েছে। খাটের পাশে। বাইরে পরার পোশাকও রয়ে গেছে সব।

জোজো হাসিমুখে বলে উঠল, ও বুঝতে পেরেছি! কাকাবাবুর হঠাৎ অদৃশ্য হওয়ার শখ হয়েছে। তাই জানলা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। তাই না রে সন্তু?

সন্তু বলল, ঠিক বলেছিস! কান্তবাবু চোখ গোল গোল করে বললেন, কী বললে? অদৃশ্য? অ্যাঁ

জোজো বলল, হ্যাঁ। কাকাবাবু তিরস্করণী মন্ত্র জানেন। সেই মন্ত্রবলে ইচ্ছে করলে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন।

কান্তবাবু বললেন, যাঃ! অত বড় মানুষটা কি জানলা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারেন?

জোজো বলল, আপনি জানেন না? অদৃশ্য হলে শরীরটা হাওয়ার মতো হয়ে যায়। তখন একটা ছোট্ট ফুটোর মধ্য দিয়েও বেরিয়ে যেতে কোনও অসুবিধে নেই। বাইরে গিয়ে ভাসতে ভাসতে চলে যাবেন। আগেও এরকম হয়েছে, তাই না সন্তু?

সন্তু বলল, বেশ কয়েকবার!

কান্তবাবু বললেন, তাই বলছ? তবে তো আমার হোটেলের কোনও দোষ নেই। তবু পুলিশকে খবরটা দিতেই হবে।

কান্তবাবুরা বেরিয়ে যাওয়ার পর সন্তু আর জোজো খাটের উপর বসে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর জোজো বলল, ঘরের চাবিটা কার কাছে ছিল? কান্তবাবুর কাছে, না অন্য কারও কাছে?

সন্তু বলল, যদি কান্তবাবুর কাছে থেকে থাকে, তা হলে বলতে হবে, ভদ্রলোক খুব ভাল অ্যাক্টিং করতে পারেন।

জোজো বলল, একটা বাংলা টিভি সিরিয়ালে এইরকম চেহারার একজন লোক অ্যাক্টিং করে মনে হচ্ছে। আমি দেখেছি। সে-ও হোটেলের মালিক।

সন্তু বলল, না না, সে অন্য লোক। তার বয়স অনেক কম।

জোজো বলল, আমরা রাত্তিরে কোনও আওয়াজ পাইনি। কেউ একজন সাবধানে চাবি দিয়ে এই ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেছে। কাকাবাবু ঘুমিয়ে ছিলেন, ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার উপরে।

সন্তু বলল, ঘরে কোনও রক্তের দাগ নেই। ধস্তাধস্তিরও চিহ্ন নেই। খুব সম্ভবত ওরা হঠাৎ কাকাবাবুর মুখ বেঁধে ফেলে নিয়ে গিয়েছে। সেদিক থেকে চিন্তার কিছু নেই।

জোজো বলল, এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ওরা মানে কারা?

সন্তু বলল, সেটাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু কোথা থেকে শুরু করা যায়?

জোজো বলল, প্রথমেই এই হোটেলের মালিকটাকে ভয় দেখাতে হবে?

কী করে ভয় দেখাবি? সে আমি জানি। তোকে ভাবতে হবে না।

আমার কী মনে হয় জানিস, জোজো। সব গন্ডগোলের মূলে আছে একটা ঘোড়া।

ঘোড়া?

হ্যাঁ, পরশুদিন গঙ্গার ধারে একটা ঘোড়া এসে হুড়মুড়িয়ে পড়ছিল কাকাবাবুর গায়ের উপর। ঘোড়াটা চালাচ্ছিল সেলিম। এইরকম কিছু হলে সকলে দুঃখ প্রকাশ করে কিংবা ক্ষমা চায়। এখানে সকলে বলছে, সেলিম খুব ভাল আর ভদ্রলোক। অথচ সে কাকাবাবুর কাছে একবারও সরি পর্যন্ত বলেনি।

তা ঠিক। এটা অদ্ভুত লাগে সত্যিই।

কাল দুবার সেলিমের সঙ্গে দেখা হল। খোশবাগে কাকাবাবু ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। কিন্তু আমাদের কিছু জানালেন না। নিশ্চয়ই কিছু সিরিয়াস ব্যাপার!

হতে পারে, হতেই পারে। তা হলে কি আমরা সেলিমের সঙ্গেই দেখা করব?

আমাদের পাত্তা দেবে কিনা জানি না। তবু চেষ্টা করতে হবে।

তার আগে, মানে পুলিশ আসবার আগেই ঘরটা একবার সার্চ করা দরকার।

দেওয়ালের গায়ে একটা আলমারিতে কাকাবাবুর কিছু জামাপ্যান্ট রয়েছে। আর মানিব্যাগ, ক্রেডিট কার্ড, একটা টর্চ।

সন্তু বলল, কাকাবাবুর রিভলভারটা নেই শুধু।

জোজো বলল, যারা কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, তারা রিভলভার তো নেবেই।

সন্তু বলল, এখন চতুর্দিকে যে অপহরণ চলছে, সেইরকমই কোনও দল হয়তো কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। এরপর টাকা চাইবে। তা হলে আমরা সেলিমের কথা ভাবছি কেন? ওদের তো অগাধ টাকাপয়সা। ওরা নিশ্চয়ই এসব ছোট কাজ করবে না।

জোজো বলল, তুই যা বললি, তা ঠিকও হতে পারে, ভুলও হতে পারে। যাদের অনেক টাকা থাকে, তাদের আরও টাকার জন্য লোভও থাকে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন না, রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি। যাই হোক, সব দিকই ভেবে দেখতে হবে।

কাকাবাবুর মানিব্যাগ, ক্রেডিট কার্ড এইসব পকেটে ভরে নিল জোজো। তারপর বলল, চল, নীচে যাই।

হোটেলের অফিস ঘরে এসে ওরা দেখল, কান্তবাবু একমনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন টেলিফোনে।

ওরা দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মিনিট।

টেলিফোনের কথা শেষ হলে তিনি ওদের দিকে চেয়ে বললেন, কী কাণ্ড হল বলো তো? কিছুই বুঝতে পারছি না।

জোজো কাচুমাচু মুখ করে বলল, এখন আমাদের কী হবে? ওরা কাকাবাবুর টাকাপয়সা সব নিয়ে গিয়েছে। আমাদের কাছে কিছুই নেই। আমরা হোটেলের বিল মেটাব কী করে? বাড়ি ফিরবই বা কী করে?

কান্তবাবু চমকে উঠে বললেন, অ্যাঁ তোমাদের কাছে টাকা নেই?

জোজো বলল, সব তো ওঁর কাছেই ছিল।

কান্তবাবু বললেন, উনি তোমাদের ফেলে রেখে চলে গেলেন? আর ফিরবেন না?

জোজো বলল, হয়তো অনেক দূরে কারও বিপদের কথা টেলিপ্যাথিতে জেনে তাড়াহুড়ো করে চলে গিয়েছেন। কান্তবাবু বললেন, টেলিপ্যাথি?

জোজো বলল, মনে মনে টেলিফোন। ফিরবেন তো নিশ্চয়ই, তবে কতদিন লাগবে ঠিক নেই। আট- দশ দিনও লেগে যেতে পারে। আমাদের তো ততদিন এখানেই থেকে যেতে হবে।

কান্তবাবু বললেন, আট-দশদিন! যদি তারও বেশি হয়?

হঠাৎ উদার হয়ে গিয়ে তিনি বললেন, ঠিক আছে। তোমাদের বিল মেটাতে হবে না। সব ছেড়ে দিচ্ছি। তোমরাও ঘরটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাও!

জোজো বলল, কোথায় চলে যাব? আমাদের ফেরার ভাড়াও নেই বললাম না? তা ছাড়া কাকাবাবুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে!

কান্তবাবু বললেন, তোমরা কোথায় যাবে, তা আমি জানব কী করে? সেটা কি আমার দায়িত্ব। তোমাদের কাকাবাবু যদি আর না-ই ফেরেন, তা বলে কি আমি তোমাদের বসে বসে অনন্তকাল খাওয়াব! আমার হোটেলে তো আমি দানছত্তর খুলে বসিনি!

এবার সন্তু বলল, আপনি আমাদের তাড়িয়ে দেবেন?

কান্তবাবু মুখ গোমড়া করে বললেন, একে মোটেই তাড়িয়ে দেওয়া বলে। কোনও হোটেলে কেউ বিনা পয়সায় থাকতে পারে নাকি? পৃথিবীতে এরকম কথা কেউ শুনেছে?

সন্তু জানলার দিকে তাকিয়ে বলল, ওই তো পুলিশের গাড়ি এসে গিয়েছে। পুলিশই এসে ঠিক করে দেবে, আমরা থাকব না চলে যাব। এখানকার পুলিশ তো খুব চটপটে।

একটা জিপগাড়ি থেকে নামল সেই ইনস্পেক্টর জাভেদ।

ভিতরে এসে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার? কাকাবাবুর কী হয়েছে?

কান্তবাবু বললেন, আরে দেখুন না ভাই, সকালবেলা এসে দেখছি, রায়চৌধুরীবাবু নেই। এদিকে ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। আমাদের তালা ভেঙে ঢুকতে হল। ভিতরটা ফাঁকা। জলজ্যান্ত মানুষটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। উনি নাকি কী মন্ত্র জানেন, তার জোরে অদৃশ্য হতে পারেন। অদৃশ্য হয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন জানলা দিয়ে।

জাভেদ ভুরু কুঁচকে বলল, কী বলছেন? অদৃশ্য? তার মানে?

জোজো হা-হা করে হেসে উঠে বলল, জ্যান্ত মানুষ আবার অদৃশ্য হতে পারে নাকি? হা-হা-হা, পৃথিবীতে এরকম কথা কেউ শুনেছে?

কান্তবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, অ্যাই, অ্যাই, তোমরাই তো একথা বলেছ আমাকে?

সন্তু বলল, আমরা ছেলেমানুষ, আমরা যা খুশি বলতে পারি। তা বলে বুড়োমানুষ হয়ে আপনি তা বিশ্বাস করবেন? এই যুগে মন্ত্রফন্ত্র দিয়ে কোনও মানুষ অদৃশ্য হতে পারে? জানলা দিয়ে হাওয়ার মতো বেরিয়ে যেতে পারে?

কান্তবাবু আবার ধমক দিয়ে বললেন, তা হলে তোমরা ও কথা বললে কেন আমাকে?

জোজো বলল, বলেছি এইজন্য, আপনি ভেবেছিলেন, কাকাবাবু নেই দেখে আমরা ভেউভেউ করে কেঁদে ফেলব। আমরা সে ধাতুতে গড়া নই। আমরা জানি, কাকাবাবুকে আটকে রাখার ক্ষমতা পৃথিবীতে কারও নেই। আমরা মোটেই ঘাবড়াইনি।

কান্তবাবু বললেন, মোট কথা, আমার কোনও দায়িত্ব নেই। ঘর ঠিকঠাক ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, তারপর মানুষটা সেখান থেকে কোথায় গেলেন, কী করে গেলেন, তা খুঁজবে পুলিশ!

জাভেদ বললেন, অবশ্যই আপনার দায়িত্ব আছে। যদি কেউ দরজা ভেঙে ঢুকত, তা হলে বোঝা যেত, চোর-ডাকাতের কারবার। কিন্তু চাবি দিয়ে দরজা খোলা হলে, সে চাবির দায়িত্ব হোটেল ম্যানেজারের। বাইরের লোক চাবি পাবে কী করে?

কান্তবাবু বললেন, হারিয়ে গিয়েছে। একটা চাবি...

জাভেদ বলল, বটে? একটা চাবি হারিয়ে গিয়েছে, একথা আপনি আগে কাউকে জানিয়েছেন? মোট কথা, আপনাকে থানায় যেতে হবে।

কান্তবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, থানায়?

জোজো জিজ্ঞেস করল, জাভেদস্যার, আমরা থানায় যাব না?

জাভেদ বলল, হ্যাঁ, তোমরাও যাবে, তোমাদের স্টেটমেন্ট নিতে হবে। আগে আমি উপরের ঘরটা একবার দেখে আসি।

জোজো বলল, তুই যা সন্তু, আমি এখানে বসছি।

কান্তবাবুও নিজে না গিয়ে দুজন বেয়ারাকে পাঠালেন।

জোজো একটা চেয়ারে বসে হাঁটু দোলাতে লাগল, আর চেয়ে রইল কান্তবাবুর দিকে।

কান্তবাবু জোজোর দিকে একেবারেই না তাকিয়ে, খাতাপত্র উলটে কাজের ভান করতে লাগলেন।

একটু পরে জোজো আদুরে গলায় জিজ্ঞেস করল, ম্যানেজারবাবু, আজ দুপুরে কী রান্না হবে?

কান্তবাবু দাত মুখ খিচিয়ে বললেন, কচু পোড়া আর কাচকলা সেদ্ধ!

জোজো তবু সরলভাবে বলল, কেন, মাছ হবে না? এখানকার গঙ্গায় ইলিশ মাছ পাওয়া যায় না?

কান্তবাবু বললেন, তোমার লজ্জা করে না? তোমাদের কাকাবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না। আর তুমি খাওয়ার কথা ভাবছ?

জোজো বলল, কেন, লজ্জা করবে কেন? কাকাবাবুই তো শিখিয়েছেন, খিদে পেলেই পেট ভরে খেয়ে নিতে হয়। না হলে ব্রেন কাজ করে না। আমার অবশ্য এখনও খিদে পায়নি। দুপুরের কথা ভাবছি!

কান্তবাবু বললেন, তোমাদের মতো খদ্দের এলে আমার হোটেলটাই তুলে দিতে হবে মনে হচ্ছে।

জোজো বলল, আপনার হোটেল এমনিতেই তুলে দিতে হবে বোধহয়।

কান্তবাবু বললেন, কেন, কেন, কেন? আমার হোটেল উঠে যাবে কেন?

জোজো বলল, আপনি বেশ ভাল রকমই ফেঁসেছেন। আপনার অ্যাক্টিং মোটেই ভাল হচ্ছে না। জাভেদসাহেব একবার থানায় নিয়ে গেলে আপনি সহজে ছাড়া পাবেন ভেবেছেন?

কান্তবাবু দারুণ রেগে গিয়ে বললেন, কী, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!

তিনি একটা পেপারওয়েট ছুড়ে মারতে গেলেন জোজোকে। শেষ মুহূর্তে সামলে নিলেন নিজেকে। পেপারওয়েটটা হাতেই ধরা রইল। এক দৃষ্টিতে জোজোর দিকে চেয়ে রইলেন, একটা ছবির মতো।

সেই সময় ফিরে এল জাভেদ আর সন্তু।

জাভেদ বলল, বিশেষ কিছু দেখবার নেই। তালাটা আজ সকালে ভাঙা হয়েছে, এই তো?

জোজো জিজ্ঞেস করল, ফিঙ্গার প্রিন্টের ছবি তুললেন না?

জাভেদ হেসে বলল, ওসব ভাই ডিটেকটিভ বইয়েই থাকে। আমাদের এই মফসসলে হাতের ছাপের ছবি তোলার কোনও ব্যবস্থাই নেই। যাই হোক, আমার যতদূর মনে হচ্ছে, ওই যারা টাকার জন্য অপহরণ করে, তাদেরই কাণ্ড। তবে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ থাকাটাই ধাঁধায় ফেলেছে। চলুন কান্তবাবু, থানায় চলুন।

থানায় বসবার জন্য চেয়ার পাওয়া যায় না, লম্বা লম্বা টুলে বসতে হয়। কান্তবাবুকে নিয়ে যাওয়া হল পাশের একটি ঘরে, সেখানে অন্য একজন লোক তাকে জেরা করবে। সন্তু আর জোজোকে সামনে বসিয়ে জাভেদ বলল, এবার বলো তো, কাল সন্ধে থেকে কী কী ঘটেছে?

বিশেষ কিছু তো বলার নেই, ফুরিয়ে গেল একটুতেই।

জাভেদ জিজ্ঞেস করল, তোমরা রাত্তিরে কোনও আওয়াজ শোনোনি?

দুজনেই মাথা নেড়ে জানাল, না।

জাভেদ বলল, কাকাবাবুর মতো একজন দুর্দান্ত ধরনের মানুষকে হোটেলের দোতলা থেকে একেবারে নিঃশব্দে ধরে নিয়ে গেল। হোটেলের আর কেউ টের পেল না। এতেই সন্দেহ হয়, হোটেলের কেউ এ ব্যাপারে জড়িত।

এরই মধ্যে একজন লোক জাভেদের কানের কাছে এসে ফিসফিস করে কী যেন বলল।

সঙ্গে সঙ্গে জাভেদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে এখনই বেরোতে হবে। একজন অপহরণকারীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, সে ব্যাটাকে ধরতে পারলে অন্যদেরও জালে ফেলা যাবে। হয়তো এরাই কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। সন্তু, তোমরা এখানেই অপেক্ষা করো, আমি ঘুরে আসছি। হয়তো একটু দেরি হতে পারে।

সন্তু বলল, আমরা আপনার সঙ্গে যেতে পারি না?

জাভেদ একটু চিন্তা করে বলল, তোমরা যাবে? কিন্তু বিপদের ঝুঁকি আছে। ওরা অনেক সময় গুলি চালায়।

সন্তু বলল, সে তো যে-কোনও জায়গায় রাস্তা পার হওয়ার সময়ও অ্যাক্সিডেন্টের ঝুঁকি থাকে।

জোজো বলল, আমরা যাব।

জাভেদ বলল, ঠিক আছে, চলো, তা হলে।

ওরা দুজনে জাভেদের সঙ্গে একটা জিপগাড়িতে উঠল। সঙ্গে আরও তিনজন বন্ধুকধারী পুলিশ।

যেতে যেতে জাভেদ বলল, এখানে অপহরণের ব্যাপারটা খুব বেড়ে গিয়েছে। যতদূর মনে হচ্ছে, একটা দলই করছে এই কাজ। ওদের একজনকে ধরতে পারলেই বাকিদের খোঁজ পাওয়া যাবে।

তারপর সে পাশ ফিরে তার এক সহকারীকে জিজ্ঞেস করল, কেষ্টবাবু, আপাতত আমরা কোন দিকে যাচ্ছি? আমাদের লোক পাকা খবর দিয়েছে তো?

কেষ্টবাবু বলল, স্যার, আমাদের গোবিন্দ অপেক্ষা করছে লালবাগের একটা বাড়ির কাছে। গোবিন্দর খবর কখনও ভুল হয় না।

লালবাগে গিয়ে সে বাড়ি খুঁজবার আগেই গোবিন্দকে দেখা গেল বড় রাস্তায়। হাত তুলে সে গাড়ি থামাল।

জাভেদ মাথা ঝুকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার? গোবিন্দ বলল, আপনারা একটু দেরি করলেন স্যার। পাখি উড়ে গিয়েছে!

জাভেদ অত্যন্ত বিরক্তভাবে বলল, এই-ই হয়, সবসময়। আমরা মোটেই দেরি করিনি। খবর পাওয়ামাত্র বেরিয়ে পড়েছি, আর কত তাড়াতাড়ি আসব? আকাশ দিয়ে উড়ে আসব?

গোবিন্দ বলল, স্যার, ক্রিমিনালদের মতিগতি তো বলা যায় না। লোকটা বেশ বেলা করে ঘুমোচ্ছিল, হঠাৎ উঠে বেরিয়ে গেল।

জাভেদ আবার জিজ্ঞেস করল, কোথায় গেল, তার কোনও ধারণা আছে? লোকটার নাম কী?

গোবিন্দ বলল, ওর দলের লোক ওকে বলে বাঁটলো। ও তালা ভাঙার ওস্তাদ। এই বাঁটলোর আর-একটা আখড়া আছে আজিমগঞ্জে, খানিকটা দূর হবে। সেখানে গিয়ে দেখবেন?

জাভেদ বলল, ইয়েস, সেখানেই যাব। চলো চলো, তুমিও পিছনে উঠে পড়ো!

জিপ আবার মুখ ঘুরিয়ে ছুটল।

এর মধ্যে বেলা বারোটা বেজে গিয়েছে। আজও আকাশ মেঘলা, তেমন গরম নেই।

রাস্তায় এক জায়গায় একটা ট্রাক উলটে গিয়েছে। সেখানে অনেক মানুষের ভিড়, গাড়িটাড়ি যেতে পারছে না।

জাভেদ বিরক্ত হয়ে বলল, এইখানে আমরা আটকে থাকব নাকি? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে বোধহয় এখনও কাকাবাবুর খবর পৌঁছোয়নি। এর মধ্যে যদি বাঁটলোকে ধরে ফেলতে পারি...

জাভেদ গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

রীতিমতো জ্যাম হয়ে গিয়েছে, কোনও গাড়ি পার হতে পারছে না। পাশেই ধানখেত। এখন অবশ্য ধান কাটা হয়ে গিয়েছে।

জাভেদ ড্রাইভারকে বলল, তুমি ওই খেতের উপর দিয়ে চালাতে পারবে? জিপগাড়ি তো...

রাস্তা আর খেতের মাঝখানে বেশ বড় গর্ত। তাই অন্য গাড়ি নামতে সাহস করছে না। জিপগাড়ির ড্রাইভার তবু নামিয়ে দিল গাড়ি, সেটা একপাশে অনেকটা হেলে পড়লেও ওলটাল না, কোনওরকমে জায়গাটা পেরিয়ে চলে এল অন্য দিকে।

সন্তু আর জোজোও জিপ থেকে নেমে পড়েছিল, ওরা দৌড়ে গিয়ে আবার উঠল।

আজিমগঞ্জে পৌঁছেও শহর ছাড়িয়ে একটা জংলামতো জায়গায় জিপটাকে নিয়ে এল গোবিন্দ। সেখানে একটা ভাঙাচোরা বাড়ি। এমনই ভাঙা যে, সেখানে কোনও মানুষ থাকে বলে মনে হয় না। আশপাশে আর কোনও বাড়িও নেই।

গোবিন্দ আঙুল তুলে বলল, ওই দেখুন, একটা সাইকেল। নিশ্চয়ই এখানে মানুষ আছে।

সত্যিই একটা সাইকেল ঠেস দিয়ে রাখা আছে একটা গাছের গায়ে।

জাভেদ বন্ধুকধারী পুলিশদের বলল, তোমরা দুজনে দুদিকে দাঁড়াও। চোখ-কান খোলা রাখবে। আর-একজন থাকবে এই দরজার কাছে।

জাভেদ রিভলভার হাতে নিয়ে সন্তু আর জোজোকে বলল, তোমরা গাড়িতেই বসে থাকো।

সন্তু বলল, না, আমরাও আপনার সঙ্গে যাব।

জাভেদ বলল, আসতে চাও? ঠিক আছে পিছনে পিছনে থাকো। যদি গুলিটুলি চলে, সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়বে?

সাবধানে এক-পা এক-পা করে এগোতে লাগল জাভেদ।

এককালে কোনও ধনী লোকের বাড়ি ছিল, এখন পরিত্যক্ত। সামনে অনেকখানি চওড়া বারান্দা, সেটা আগাছায় ভরা। দরজা-জানলা ভাঙা।

জোজো ফিসফিস করে বলল, ঠিক সিনেমার মতো মনে হচ্ছে, না রে?

সন্তু বলল, হ্যাঁ। সিনেমায় এরপর কী হয় বল তো? আসামি পালিয়ে যায়। সাবধানে থাকতে হবে।

জাভেদ ওদের দিকে ফিরে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ!

প্রথম দুটো ঘর একবারে ফাঁকা। কোনও মানুষ থাকার চিহ্নই নেই।

তারপর একটা ঘরের কাছে আসতেই দ্যাখা গেল, ভিতরে একটা টেবিলে বসে একজন লোক কী যেন খাচ্ছে।

গোবিন্দ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মাথা নাড়ল, তার মানে, ওই লোকটাই বাঁটলো। একজন স্ত্রীলোক বাঁটলোকে কিছু একটা খাবার এনে দিল।

জাভেদ সেই ঘরের মধ্যে ঢুকতেই বাঁটলো উঠে দাঁড়াল।

জাভেদ ঠান্ডা গলায় বলল, ওঠবার দরকার নেই। খাচ্ছিস, খেয়ে নে। খাওয়ার মাঝখানে কোনও মানুষকে আমি অ্যারেস্ট করি না।

বাঁটলো আবার বসে পড়ে বলল, আপনারা...আপনারা আমাকে ধরতে এসেছেন কেন? আমি কী করেছি?

জাভেদ বলল, সে কথা পরে হবে। বলছি না, খেয়ে নে আগে!

বাঁটলো আবার খেতে শুরু করল। তার খাওয়ার শপশপ শব্দ হচ্ছে।

সন্তু বেরিয়ে গেল বাইরে।

জোজো জিজ্ঞেস করল, জাভেদদা, ও কী খাচ্ছে?

জাভেদ বলল, পান্তাভাত আর বেগুনপোড়া।

জোজো বলল, মাছ, মাংস কিছু নেই?

জাভেদ বলল, দেখছি না তো!

জোজো বলল, এরা নিশ্চয়ই অপহরণ করে অনেক টাকা পায়। তা দিয়ে কী করে? ভাল করে খায় না?

জাভেদ বলল, পান্তাভাত এখানে অনেকে খুব পছন্দ করে। আমিও খুব খাই। তবে এর সঙ্গে আলু দিয়ে চিংড়ি মাছের ঝাল থাকলে আরও ভাল।

বাঁটলো বলল, আমি তো স্যার ভ্যান রিকশা চালাই। আমায় কেন ধরতে এসেছেন। ওই গোবিন্দটা আপনাদের ভুল খবর দিয়েছে।

গোবিন্দ বলল, আমাকে চেনে দেখছি। ও আগেও একবার ধরা পড়তে পড়তে পিছলে গিয়েছিল।

জাভেদ ধমক দিয়ে বলল, তোর খাওয়া হয়েছে? শেষ কর, তাড়াতাড়ি শেষ কর। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?

বাঁটলো বলল, এই তো, হয়ে গেছে।

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞেস করল, আর ভাত নেবে না?

বাঁটলো বলল, নাঃ, পেট ভরে গিয়েছে। এবার একটু আঁচিয়ে নিই স্যার?

জাভেদ বলল, বাইরে যেতে হবে না। এখানেই হাত ধুয়ে নে।

বাঁটলো বলল, বাইরে যাব না, এই তো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে...

অন্যদিকের পাল্লা-ভাঙা দরজার কাছে রাখা আছে একটা জলের জাগ।

সেটা তুলে নিয়েই হাত ধোওয়ার বদলে ছুড়ে মারল জাভেদের দিকে। ঠিক সময় মাথাটা সরিয়ে না নিলে জাগটা জাভেদের মাথা ফাটিয়ে দিত।

এরই মধ্যে বাঁটলো লাফিয়ে বাইরে নেমে লাগাল দৌড়।

দশ-বারো পায়ের বেশি যেতে পারল না। একটা দেওয়ালের আড়াল থেকে সন্তু বেরিয়ে এসে তার পায়ে একটা ল্যাং মারল।

বাঁটলো পড়ে গেল ধপাস করে।

ততক্ষণে জাভেদ নিজেকে সামলে নিয়ে বাইরে চলে এসেছে।

বাঁটলোর পিঠের উপর পা দিয়ে বলল, পালাতে চাইছিলি, তাই না? এই ছেলেটি তোর কী উপকার করেছে জানিস? তুই যদি আর-একটু দূরে যেতিস, আমার পুলিশ তোকে গুলি করে ঝাঝরা করে দিত। এই ছেলেটির জন্য তুই বেঁচে গেলি!

সন্তু বলল, পুলিশের গুলি ওর গায়ে না-ও লাগতে পারত।

জাভেদ বলল, ওকে বাঁচিয়ে রাখাই আমাদের দরকার। এই, ওঠ!

বাঁটলো উঠে দাঁড়াতেই জাভেদ তার চুলের মুঠি চেপে ধরে বলল, কাকাবাবুকে তোরা কোথায় নিয়ে রেখেছিস?

বাঁটলো অবাকভাবে বলল, কাকাবাবু? কার কাকাবাবু? আমি তো চিনি না!

জাভেদ বলল, কাল রাত্তিরে তোরা রত্নমঞ্জুষা হোটেল থেকে একজন খোঁড়া ভদ্রলোককে ধরে নিয়ে গিয়েছিস। তিনি এখন কোথায়?

বাঁটলো বলল, রত্নমঞ্জুষা? সে হোটেলে আমি জীবনে কখনও ঢুকিনি। কোনও খোঁড়া ভদ্রলোককে ধরে নিয়ে যাওয়ার কথা আমি কিছুই জানি

জাভেদ বলল, এঃ, তুই কিছুই জানিস না? সত্যি কথা বল, তা হলে কম শাস্তি পাবি। নইলে তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে।

বাঁটলো এবার কাঁদোকাঁদো হয়ে বলল, সত্যি বলছি স্যার। মা কালীর দিব্যি।

জাভেদ বলল, ওসব দিব্যিটিব্যি আমি বুঝি না। আমি দশ গুনব, তার মধ্যে যদি না বলিস... এক, দুই...

বাঁটলো বলল, সত্যি কথাটা শুনুন স্যার। আমরা ভাড়া খাটি। আমাদের একজন এসে বলে, অমুক লোকটাকে ধরে এনে দিতে হবে। আমরা তাকে ধরে এনে দিই। তার জন্য আমরা খুব কমই পয়সা পাই। তারপর সেই লোকটাকে নিয়ে ওরা কী করে, তা আমরা জানি না। এর মধ্যে শুধু এরকম একটা কেস করেছি, সে লোকটার নাম ফিরোজ শাহ। কাকাবাবু বলে কারও নাম শুনিনি।

জাভেদ বলল, কে তোদের এরকম লোক ধরে আনার বরাত দেয়?

বাঁটলো বলল, সে নাম কি আমি বলতে পারি স্যার। এ লাইনে একবার নামটাম বলে দিলে আমার দলের লোকরাই আমাকে খুন করে ফেলবে।

জাভেদ বলল, আর না বললে যে আমি তোকে খুন করে ফেলতে পারি? তোকে গুলি করে মেরে ফেলে তারপর রিপোর্ট লিখব, তুই আমাকে ছুরি দিয়ে মারতে এসেছিলি।

ব্যস। মিটে গেল। বরং থানায় আমাদের কাছে রাখলে তোর দলের লোক কোনও ক্ষতি করতে পারবে না!

এরপর বাঁটলোকে জিপে তুলে এনে নিয়ে আসা হল থানায়।

সেখানে সারাদিন ধরে জেরা করা হল বাঁটলোকে।

কিছুতেই তার পেট থেকে কথা বের করা যায় না।

প্রায় সন্ধের সময় সে তার দলের একজনের নাম বলে ফেলল।

সন্তু আর জোজো সর্বক্ষণ বসে বসে সব শুনছিল। জাভেদ তাদের বলল, আমার মনে হচ্ছে, এ-লোকটা সত্যিই কাকাবাবু সম্পর্কে কিছু জানে না। এতক্ষণ ধরে জেরা করছি। জানলে একটা কিছু বলে ফেলত। ফিরোজ শাহর কেসটা স্বীকার করেছে। আমার ধারণা, কাকাবাবুর অপহরণের ব্যাপারটা অন্য কোনও দলের কাজ।

সন্তু বলল, সব শুনে আমারও মনে হল, বাঁটলো লোকটি সত্যিই কাকাবাবুর কথা জানে না। কতক্ষণ আর একটা লোক মিথ্যে কথা বলতে পারে?

জাভেদ বলল, তবু আর-একটা লোকের খোঁজ যখন পাওয়া গেছে, তাকে ধরতে পারি কিনা দেখি। তার কাছ থেকে হয়তো আরও কিছু খবর পাওয়া যাবে। তোমরা হোটেলে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি রাত্তিরে তোমাদের খবর দেব।

জোজো বলল, বাবা রে! সারাদিন ধরে শুধু একই কথা, একটি কথা শুনছি। মাথা ধরে গিয়েছে। আমি এখন হোটেলেই ফিরতে চাই!

সন্তু বলল, অন্য লোকটা যদি ধরা পড়ে, তাকে একবার দেখব না?

জাভেদ বলল, ধরা পড়লে তোমাদের খবর দেব। হোটেল থেকে ডাকিয়ে আনব।

সন্তু বলল, ঠিক আছে!

দুজনে বেরিয়ে পড়ল থানা থেকে।

জোজো বলল, তোর খিদে পায়নি সন্তু? দুপুরে তো প্রায় কিছুই খাইনি!

দুপুরে থানায় কয়েকখানা রুটি, ডাল আর কিমার তরকারি খেতে দেওয়া হয়েছিল দোকান থেকে আনিয়ে। তাতে জোজোর পেট না ভরারই কথা। কিংবা পেট ভরলেও মন ভরেনি। বারবার বলছিল, আমি কিমার তরকারি পছন্দ করি না। এর মধ্যে অনেক ভেজাল থাকে।

জোজো বলল, কাকাবাবুর মানিব্যাগ তো আমার কাছে আছে। চল, কোনও রেস্তরাঁয় গিয়ে ভাল করে খেয়ে নিই।

সন্তু বলল, কাকাবাবু কোথায় আছেন, তাকে কিছু খেতে দেওয়া হয়েছে। কিনা, তাই বা কে জানে!

জোজো বলল, সেই ভেবে কি আমরা না খেয়ে থাকব? তাতে কোনও লাভ হবে? কাকাবাবুই তো বলেছেন, খিদে পেলেই ভাল করে খেয়ে নিতে হয়, না হলে ব্রেন কাজ করে না?

একটা পাঞ্জাবির দোকানে ঢুকে ওরা কষা মাংস, রুটি আর মিষ্টি দই খেয়ে নিল।

জোজো তৃপ্তির সঙ্গে বলল, আঃ! এইবার আমার ব্রেন ভাল কাজ করছে। এখন আমাদের কী করা উচিত বল তো?

সন্তু বলল, তুই বল!

জোজো বলল, সকালে আমরা প্রথমে সেলিমের কথা ভেবেছিলাম। এখন একবার চল, সেলিম কিংবা আমির আলির সঙ্গে দেখা করে আসি। ওঁরা কাকাবাবুর খবরটা জানেন কিনা তাও বোঝা যাবে।

সন্তুও ঠিক এটাই ভাবছিল। সে মুখে কিছু না বলে একটা সাইকেল রিকশা ডাকল।

আমির আলি সাহেবের সেই সাদা রঙের বাড়ির সামনের গেট বন্ধ।

পাহারাদারটি ওদের কথা শুনে বলল, ভিতরে যাওয়া যাবে না। যখনতখন দেখা করার হুকুম নেই।

জোজো বলল, কাল আমাদের এখানে নেমন্তন্ন ছিল, আপনার মনে আছে তো? তারপর হয়েছে কী, পকেট থেকে আমার একটা আইডেন্টিটি কার্ড কখন পড়ে গেছে। সেটা হারিয়ে গেলে খুব মুশকিল হবে। একবার ভিতরে গিয়ে ম্যানেজারবাবুকে জিজ্ঞেস করব শুধু। যদি কার্ডটা এখানে থাকে...

পাহারাদার কিছুতেই শুনতে চায় না।

অনেক কাকুতিমিনতি করার পর গেটটা খুলে দিয়ে বলল, ঠিক আছে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে আসবে।

সামনের বাগানে কয়েকটা আলো জ্বলছে। তার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই সাদা ঘোড়াটা।

সন্তু ঘোড়াটার গলা চাপড়ে একটু আদর করতেই সেটা বেশ খুশি হয়েছে। মনে হল।

সন্তু বলল, বেশ ভাল জাতের ঘোড়া। ভদ্র।

জোজো বলল, সন্তু, যদি কুকুর দুটো আসে?

সন্তু বলল, এইসব বাড়ির কুকুর প্রথমেই কামড়ায় না। ট্রেনিং দেওয়া থাকে। কাছে এসে জোরে জোরে ডাকে। ভয় পাবি না, দৌড়োবি না, একদম চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবি। আমি সামলে নেব।

কুকুর দুটো অবশ্য দেখা গেল না।

বারান্দায় উঠে এসে সন্তু একটা দরজায় টোকা দিল। তারপর দেখল, পাশে একটা ডোরবেলও আছে।

দরজা খুলে মুখ বাড়ালেন সেই ম্যানেজারবাবু, যিনি কাল আমিরসাহেবের চিঠি নিয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি ওদের দেখে বেশ অবাক।

শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার?

জোজো বলল, আমরা একবার আমিরসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ম্যানেজারবাবু মুখ ভেংচে বললেন, দেখা করতে চাই বললেই দেখা করা যায়? এ কি মামার বাড়ি পেয়েছ নাকি? ওঁর শরীর ভাল নেই।

সন্তু বলল, তা হলে কি সেলিমসাহেবকে একবার ডেকে দেবেন?

জোজো বলল, আমাদের কাকাবাবু সেলিমসাহেবকে একটা জরুরি কথা বলে পাঠিয়েছেন।

ম্যানেজার বললেন, বটে! খুব মিথ্যে কথা বলতে শিখেছ তো? তোমাদের কাকাবাবু সেলিমসাহেবকে জরুরি কথা বলে পাঠিয়েছেন! এমন হাসির কথা কখনও শুনিনি!

সন্তু বলল, আপনি এত রেগে যাচ্ছেন কেন? আমরা সেলিমসাহেবের সঙ্গে মাত্র দু-তিন মিনিট কথা বলব!

ম্যানেজারবাবু বললেন, সেলিমসাহেব যখন-তখন বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করেন না। যাও যাও, সরে পড়ো। তিনি দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

জোজো বলল, যাঃ বাবা! কাল দুপুরে অত যত্ন করে খাওয়াল এ বাড়িতে আর আজ এখানে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল!

সন্তু বলল, বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ। আমার মনে হয়, আমির আলি সাহেব কিংবা সেলিমসাহেবকে খবর দিলে নিশ্চয়ই একবার দেখা করতেন। এই ম্যানেজারই দেখা করতে দিল না।

জোজো বলল, ওই ম্যানেজার কেন বলল, কাকাবাবু সেলিমসাহেবকে একটা জরুরি কথা বলে পাঠিয়েছেন, সেটা একটা হাসির কথা?

সন্তু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তার মানে বুঝলি না? আমি বুঝেছি। তার মানে হল, ম্যানেজারবাবু জানেন, কাকাবাবুর পক্ষে এখন কোনও খবর পাঠানো সম্ভব নয়। কাকাবাবু কোথাও বন্দি হয়ে আছেন।

জোজো বলল, অ্যাঁ তাই তো। এ বুড়ো জানল কী করে?

সন্তু বলল, সেটাই তো প্রশ্ন। তা ছাড়া জানিস জোজো, কেউ অকারণে অভদ্র ব্যবহার করলে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। আমরা আমিরসাহেব আর সেলিমসাহেবের সঙ্গে শুধু দেখা করতে চেয়েছি। যতই বড়লোক হোক, তাদের সঙ্গে অন্য কেউ দেখা করতে চাইতে পারে না? সেইজন্য মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেবে? আমার ইচ্ছে করে, এদের উপর একটা কিছু প্রতিশোধ নিতে।

জোজো বলল, কী প্রতিশোধ নিবি? দরজাই খুলবে না।

সন্তু বলল, একটা উপায় আছে। আমি কিছুদিন ঘোড়া চালানো শিখেছি। ভালই পারি। এই সাদা ঘোড়াটা নিয়ে যদি পালিয়ে যাই। সেলিমসাহেবের প্রিয় ঘোড়া, নিশ্চয়ই সেলিমসাহেব কষ্ট পাবে। ছোটাছুটি করবে এদিক ওদিক। সেটাই হবে ওর শাস্তি।

জোজো বলল, তুই ঘোড়াটা নিয়ে যাবি? আমি তা হলে কী করব?

সন্তু বলল, তুই আমার পিছনে বসে শক্ত করে ধরে থাকবি। পারবি না?

সন্তু কাছে গিয়ে ঘোড়াটাকে একটু আদর করে চড়ে বসল। ঘোড়াটা আপত্তি করল না।

জোজোকেও তুলে নিয়ে সন্তু টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল খোলা গেট দিয়ে।

৫. কাকাবাবুর জ্ঞান ফিরলে

কাকাবাবুর জ্ঞান ফিরলেও ঘোর কাটতে খানিকটা সময় লাগল।

প্রথমে তিনি ভাবলেন, এটা হোটেলের ঘর, না কোন ঘর? খাটটা অনেক বড়। হোটেলের ঘরের দেওয়ালে গঙ্গার একটা বাঁধানো ছবি ছিল। এ ঘরের কোনও দেওয়ালে কোনও ছবি নেই।

তারপর তিনি দেখলেন, তিনি তার ডোরাকাটা স্লিপিং সুটটাই পরে আছেন। এই পোশাক পরে তো তিনি বাইরে যান না। তা হলে এই একটা অন্য ঘরে এলেন কী করে?

তারপর তার মনে পড়ল, মাঝরাত্তিরে কীসের যেন ধোঁয়ায় তার দম আটকে আসছিল, মাথা ঘুরছিল। তখন কয়েকজন লোক তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। অন্ধকারে তাদের মুখ দেখতে পাননি ভালো করে।

এবার তিনি উঠে বসলেন। খাটের পাশেই একটা ছোট শ্বেতপাথরের টেবিল। তার উপর পরিপাটি করে সাজানো রয়েছে একটি দামি ড্রেসিং গাউন।

পাশের একটা থালায় অনেক রকম ফল। একটা বড় গেলাস ভরতি কীসের যেন শরবত। আর-একটা জলের জাগ।

খাটের পাশেই রয়েছে একজোড়া নতুন চটি। কাকাবাবু ভাবলেন, এ যে রাজকীয় ব্যবস্থা দেখছি। আগে অনেকবার, অনেক জায়গায় তাকে আটকে রাখা হয়েছে, কিন্তু কোথাও এত খাতির পাননি।

খাট থেকে নেমে ড্রেসিং গাউন পরে দেখলেন। বেশ ফিট করেছে। চটি জোড়াও তাই।

ড্রেসিং গাউনটা পরতে গিয়ে তার স্লিপিং সুটের একটা পকেট ভারী ভারী লাগল। সেখানে হাত দিয়ে একেবারে তাজ্জব হয়ে গেলেন।

তার রিভলভার। পকেটেই ছিল, ওরা কেড়ে নেয়নি? এ আবার কেমন বন্দি করে রাখা? তিনি যেন কারও বাড়িতে অতিথি। তা হলে জোর করে ধরে আনল কেন?

তেষ্টা পেয়েছে, কাকাবাবু শরবতের বদলে খানিকটা জল খেলেন। তারপর গেলেন বাথরুমে।

জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়।

বাইরে রীতিমতো ঝোপ-জঙ্গল। এখানে-সেখানে ভাঙা দেওয়াল। হাত-পা ভাঙা মূর্তি, আধখানা দরজা। বোঝা যায়, এটা একটা খুব পুরনো আমলের বাড়ি, প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মুখে, শুধু বোধহয় দু-একটা ঘর আর বাথরুম সারিয়ে নেওয়া হয়েছে।

শহরের কাছাকাছি নয় বোধহয়।

তিনি বাথরুম থেকে বেরোতেই একজন বুড়ো লোক এসে জিজ্ঞেস করল, স্যার আপনি কী খাবেন? চা না কফি?

কাকাবাবু বললেন, আগে চা-ই নিয়ে এসো। পরে কফি খাব।

লোকটি বলল, তখন কি কফির সঙ্গে ডিমের পোচ দেব? না অমলেট, হাফ বয়েল? টোস্ট খাবেন, না পরোটা?

কাকাবাবু হেসে ফেললেন। এ যে ফাইভ স্টার হোটেলের মতো ব্যাপার!

তিনি বললেন, সে পরে দেখা যাবে, এখন শুধু চা নিয়ে এসো।

একটু পরেই লোকটি ঠিক বড় হোটেলের মতোই ট্রে-তে সাজিয়ে পোর্সেলিনের পটে চা, খুব দামি সোনালি বর্ডার দেওয়া কাপ-প্লেট আর দুধ, চিনি আলাদা করে নিয়ে এল।

হোটেলের বেয়ারাদের টিপ্স দিতে হয়। কাকাবাবুর কাছে পয়সাটয়সা কিছু নেই।

চায়ে চুমুক দিয়ে তিনি ভাবলেন, সন্তু আর জোজো এখন কী করছে? সকালে উঠে ওরা তাকে দেখতে না পেয়ে কী করবে?

তবে তিনি জানেন, সন্তু সহজে ঘাবড়াবার ছেলে নয়। এরকম অভিজ্ঞতা তার আগেও হয়েছে অনেকবার।

তিনি যদি এখান থেকে চলে যেতে চান, কেউ কি বাধা দেবে? তার সঙ্গে রিভলভারটা আছে, তাঁকে কে আটকাবে?

মুশকিল হচ্ছে, তার ক্রাচ দুটো নেই। এই অবস্থায় তিনি হাঁটবেন কী করে? এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হয়। সেটা একটা বিশ্রী ব্যাপার।

তবু তিনি চা শেষ করে ঘরের বাইরে এলেন।

একটা বারান্দা, সেটার বেশ করুণ অবস্থা। একটা দিক একেবারে ভেঙে পড়েছে। বাড়িটা অন্তত দেড়শো-দুশো বছরের পুরনো। নিশ্চয়ই নবাবি আমলের বাড়ি।

বারান্দা দিয়ে একটু এগোতেই পাশের আর-একটা ঘর দেখা গেল। দরজা খোলা। সেখানে হুইল চেয়ারে বসে আছেন আমির আলি। একজন লোক তার পিঠ ম্যাসাজ করে দিচ্ছে।

তিনি বললেন, গুড মর্নিং রায়চৌধুরীসাহেব। রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়েছিল তো? কোনও অসুবিধে হয়নি?

কাকাবাবু বললেন, না, অসুবিধে আর কী হবে? ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে দিলে চমৎকার ঘুম হয়। আপনি ভাল আছেন তো?

আমির আলি একটু লজ্জিতভাবে বললেন, আপনাকে ওরকমভাবে নিয়ে আসাটা ঠিক হয়নি। ছেলে-ছোকরাদের ব্যাপার। মাথা গরম করে ফেলে!

কাকাবাবু বললেন, আপনি আমাকে খবর দিলেই তো আমি চলে আসতাম। এরকম ধরেটরে আনার দরকার ছিল না!

আমির আলি হাতের ইঙ্গিতে অন্য লোকটিকে চলে যেতে বললেন।

তারপর অন্য একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসুন রায়চৌধুরীবাবু। আমার ছেলে আপনাকে এই জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতে বলেছিল। সেটা শুনলেই ভাল করতেন। তা হলে আর কোনও গন্ডগোল হত না।

কাকাবাবু বললেন, এটা আপনার ছেলের আবদার। সে তো বেশ বড় হয়ে গিয়েছে। এরকম বাজে আবদার করে কেন? আমার যতদিন ইচ্ছে এখানে থাকব, তাতে সে বাধা দেওয়ার কে?

আমির আলি বললেন, বাজে আবদার নয়। আমরা এখানে এমন একটা কাজ করতে যাচ্ছি, যার মধ্যে আপনার জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। আপনি নাকি অন্যদের ব্যাপারে নাক গলান? বেশ কয়েকজন আমাদের একথা বলেছে।

কাকাবাবু বললেন, আমার নাকটা এমন কিছু লম্বা নয় যে, সব ব্যাপারে গলাতে যাব। তবে আমার নাক বাজে গন্ধ সহ্য করতে পারে না। আপনারা যে কাজটা করতে যাচ্ছেন, সেটা কী? মানুষ খুন?

আমির আলি শান্তভাবে বললেন, জি হ। আপনি এর মধ্যেই জেনে ফেললেন কী করে?

আপনার ছেলেই আমাকে সেকথা বলেছে। আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, আপনার মতো একজন ভদ্রলোক, মানী লোক, কী করে মানুষ। খুন করার মতো অমানবিক কাজ সমর্থন করছেন?

সেটা আপনাকে বুঝতেও হবে না। কিন্তু আপনি কি পুলিশ? খুনের তদন্ত করা আপনার কাজ?

না। সেটা আমার কাজ নয়। আমি পুলিশও নই। কিন্তু কোথাও কেউ খুন হচ্ছে, সেটা জানতে পারলে তা আটকানোর চেষ্টা করা তো যে-কোনও মানুষেরই কর্তব্য।

যাকে খুন করা হবে, সেটা মানুষ নয়। নরকের পোকা!

আমার মতে সব মানুষই সমান। সব মানুষেরই বেঁচে থাকার অধিকার। আছে। কেউ যদি কোনও অন্যায় করে, আইন অনুযায়ী তার শাস্তি হবে। অন্য কেউ তাকে মারতে পারবে না, সভ্য সমাজে সে অধিকার নেই।

এটা একটা পারিবারিক ব্যাপার। আমাদের পরিবারের কাউকে যদি একজন খুন করে, তা হলে তাকে কিংবা সেই পরিবারের একজনকে খুন করতে না পারলে শান্তি হয় না। একে বলে রক্ত- ঋণ। আম্রা এক পূর্বপুরুষের রক্ত-ঋণ শোধ করব।

সে তো আরব দেশে এরকম প্রথা ছিল শুনেছি।

মনে করুন, আমরাও আরবেরই লোক। অন্তত কোনও এক সময় ছিলাম।

কিন্তু এটা স্বাধীন ভারত। এখানে রক্ত-ঋণটিন চলে না। এখানে যেকোনও কারণেই হোক, কোনও মানুষকে খুন করলে আপনাদের শাস্তি পেতেই হবে! যে খুন করবে, তার ফাঁসিও হতে পারে।

আমির আলি একটা হাত তুলে বললেন, এ কী! আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?

কাকাবাবু বললেন, খুনটুনের কথা শুনেও উত্তেজিত হব না? আপনি এত ঠান্ডা মাথায় এসব বলছেন কী করে, তাতেই আশ্চর্য হচ্ছি।

আমির আলি বললেন, শুনুন, আমাদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। খুনটা হবে অনেকের চোখের সামনে। তবু কেউ আমাদের দোষী করবে। কার খুনের বদলা নেওয়া হচ্ছে শুনলে আপনারও সমর্থন করা উচিত।

কাকাবাবু বললেন, কোনও কারণেই আমি মানুষ খুন সমর্থন করতে পারব না। তবু শুনি, আপনারা কার খুনের বদলা নিতে চান?

এই বাড়িটার নাম পান্নামহল। এখন প্রায় সবই ভেঙেচুরে গিয়েছে। এ বাড়ি কার ছিল জানেন? আমিনা বেগমের।

কোন আমিনা বেগম?

সিরাজদ্দৌল্লার জননী!

এটা অত দিনের পুরনো বাড়ি?

হ্যাঁ। এ বাড়ি আমাদের। আমরা সিরাজের বংশধর।

কাকাবাবু এবার হেসে ফেলে বললেন, কী যে বলেন? সিরাজের কোনও ছেলে ছিল নাকি?

আমির আলির মুখে হাসি নেই। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। তিনি জোর দিয়ে বললেন, ছেলে ছিল না, কিন্তু মেয়ে ছিল! এখনকার বিজ্ঞান বলে, শুধু ছেলেদের কেন, মেয়েদেরও একই বংশ। একই জিন রক্তে প্রবাহিত হয়। আপনার পিছনের দেওয়ালে একটা ছবি আছে। দেখুন তো কার ছবি?

কাকাবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে বললেন, ও তো সিরাজের ছবি। নবাব সিরাজদ্দৌল্লার ওই একটা ছবিই তো দেখা যায় সব বইয়ে। মাথায় পালক গোঁজা শিরস্ত্রাণ।

আমির আলি বললেন, এবার বলুন তো, আমার ছোট ছেলে সেলিমের সঙ্গে ওই ছবির হুবহু মিল নেই?

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, ওইরকম সাজলে গুজলে হয়তো একরকম দেখাতেও পারে। কিন্তু তাতে কী হল, একটা ছবির সঙ্গে একজন মানুষের খানিকটা মিল থাকলেও থাকতে পারে।

আমির আলি কঠোরভাবে বললেন, আমার ছোট ছেলে সেলিম নবাব সিরাজের শেষতম বংশধর। ওর মধ্যে আবার সিরাজ ফিরে এসেছেন।

কাকাবাবু বললেন, এ আপনি কী বলছেন, আলিসাহেব? নবাব সিরাজের মৃত্যু হয়েছে আড়াইশো বছর আগে। এতদিনে বংশটংশের কোনও চিহ্ন থাকে?

আমির আলি বললেন, কেন থাকবে না। ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের একই বংশ নেই? রানির ছেলেও একই বংশ। আমার কাছে ডেফিনিট প্রমাণ আছে। দশ বছর আগে আমি একটা পুরনো খাতা আবিষ্কার করেছি। তাতে আমাদের বংশতালিকা দেওয়া আছে। তার থেকেই জানা যায়, আমরা সিরাজ ও লুতফা বেগমের বংশধর।

কাকাবাবু বললেন, সেই জন্যই আপনি এখানকার বাড়ির নাম রেখেছেন চেহেল সুতুন? নবাব আলিবর্দির বাড়ির ওই নাম ছিল। নামটা দেখেই আমার খটকা লেগেছিল।

আমির আলি বললেন, হ্যাঁ, আলিবর্দিও আমাদের পূর্বপুরুষ। আমরাই বাংলা-বিহার-ওড়িশার মালিক।

কাকাবাবু বললেন, কিন্তু এখন তো স্বাধীন দেশ। এখন তো কেউ কোনও রাজ্যের মালিক নয়। এখন গণতন্ত্র। যারা নির্বাচনে জেতে, তারা দেশ চালায়। নবাব-বাদশা, রাজা-মহারাজদের দিন কবে শেষ হয়ে গিয়েছে!

আমির আলি বললেন, রাজত্ব শেষ হলেও টাইটল তো আছে। গায়ত্রী দেবী জয়পুরের মহারানি। আসল মহারানি এখন না হলেও সকলে তো মহারানিই বলে। যেমন পটৌডির নবাব, কুচবিহারের রাজা, ত্রিপুরার মহারানি, মাণ্ডির রাজা ...। সেইরকম, আমার ছেলে সেলিমও হবে বাংলার নবাব!

কাকাবাবু হালকাভাবে বললেন, নতুন করে বাংলার নবাব। বেশ তো! তার জন্য গভর্নমেন্টকে চিঠি লিখুন। সরকার যদি মেনে নেয়, তা হলে আমাদেরও মেনে নিতে আপত্তি নেই। কিন্তু এর মধ্যে খুনটুনের কথা আসছে কোথা থেকে?

আমির আলি বললেন, আমার ছেলে সেলিম সিরাজের যোগ্য উত্তরাধিকারী। তাকে সেই যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। সিরাজকে যারা মেরেছে, তাদের অন্তত একজনকে খুন করে প্রতিশোধ না নিলে রক্ত-ঋণ শোধ হবে না!

এ কী অদ্ভুত কথা! সিরাজ খুন হয়েছিল আড়াইশো বছর আগে। তার খুনিদের এখন পাবেন কোথায়?

তাদের বংশধর কেউ না-কেউ আছে। সেই জন্যই আমরা প্রতি বছর এসে খোঁজ করি।

সিরাজের হত্যার জন্য আসল দায়ী তো ইংরেজরা। তারা এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে, তাদের সঙ্গে আমাদের আর কোনও সম্পর্ক নেই। মিরজাফররা তো ছিল ইংরেজদের হাতের পুতুল।

তবু তাদের বংশধরদের রক্তে রয়ে গেছে সেই পাপ। আমরা মিরজাফর বা মিরনের কোনও সরাসরি বংশধরকে খুঁজছিলাম। এদের অনেকেই বিদেশে চলে গিয়েছে। শেষপর্যন্ত এবারেই একজনকে পেয়েছি। একেবারে আসল লোক। তাকে মারলেই আমাদের সত্যিকারের পুণ্য হবে।

সে কে?

দেখতে পাবেন, দেখতে পাবেন। আপনার সামনেই তাকে খতম করা হবে?

এইসময় ঘরে ঢুকল সেলিম। সে প্রায় ছবির নবাবের মতোই সাজ করেছে। মাথায় পালকের মুকুট। কোমরে তলোয়ার। এখন এরকম পোশাক দেখলে যাত্রাদলের নবাব মনে হয়। তার এক হাতে একটা চাবুক।

গম্ভীরভাবে সে বলল, আব্বাজান, এই লোকটির সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। হয়তো তোমার পছন্দ হবে না। তুমি একটু অন্য ঘরে যাবে?

আমির আলি বললেন, কী বলবি, বল না আমার সামনেই।

সেলিম কাকাবাবুর দিকে ফিরে কটমট করে চেয়ে রইল।

কাকাবাবু বললেন, সেলিমসাহেব, আপনি আমাকে পরদিন সকাল পর্যন্ত সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই মাঝরাত্রে আমাকে অজ্ঞান করে ধরে আনলেন। আমি আশা করেছিলাম, আপনি ভদ্রলোকের মতো কথা রাখবেন। সেই জন্যই আমি রাত্তিরবেলা সাবধান হইনি।

সেলিম রুক্ষ স্বরে বলল, ভদ্রলোক? আমি ভদ্রলোক নই, আমি নবাব। আমি যখন-তখন ইচ্ছেমতো মত বদল করতে পারি। আমার মনে পড়ল, আমার কাছে আপনার ক্ষমা চাওয়া বাকি আছে। আপনি চেয়ার থেকে নেমে মাটিতে নিলডাউন হয়ে বসুন, তারপর হাতজোড় করে আমার কাছে ক্ষমা চান।

কাকাবাবু দারুণ অবাক হয়ে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ভুরু তুলে বললেন, আমি ক্ষমা চাইব? কেন? আমি আবার কী দোষ করলাম? লোকে তো বলছে, আপনি ঘোড়া চালিয়ে আমার গায়ে এসে পড়ছিলেন, আপনারই ক্ষমা চাওয়া উচিত।

সেলিম বলল, নবাব কখনও সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমা চায় না। আপনি গুলি চালালেন, তাই ঘোড়াটা খেপে গেল।

কাকাবাবু বললেন, বাঃ, ঘোড়াটা হুড়মুড় করে আমার গায়ে এসে পড়বে, আমার হাত-পা ভাঙবে, আমি থামাবার চেষ্টা করব না? এরকম অদ্ভুত কথা কখনও শুনিনি!

সেলিম বলল, ঘোড়াটা হঠাৎ খেপে গেল বলেই আমি ঘোড়া থেকে পড়ে গেলাম। নবাব বংশের কেউ কখনও সাধারণ মানুষদের সামনে ঘোড়া থেকে পড়ে যায় না!

কাকাবাবু হাসি চেপে বললেন, আপনি ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছেন, তার কারণ আপনি ভাল করে শেখেননি। নবাব বংশের লোক হলেও ঘোড়া চালানো শিখতে হয়।

সেলিম একটু এগিয়ে এসে হাতের চাবুকটা দুলিয়ে বলল, মাটিতে নেমে বসুন, ক্ষমা চান। না হলে চাবুক খেতে হবে।

কাকাবাবু বললেন, যে-নবাব সাধারণ মানুষকে বিনা দোষে চাবুক মারে, তার নবাবি বেশিদিন টেকে না। আপনি নিজেকে নবাব ভাবুন আর নাই-ই ভাবুন, এই অপরাধে পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করতে পারে।

সেলিম রক্তচক্ষে বলল, ওসব বাজে কথা শুনতে চাই না। নামুন মাটিতে!

কাকাবাবু বললেন, না।

সেলিম এবার সত্যি সত্যি এক ঘা চাবুক কষাল কাকাবাবুর গায়ে!

কাকাবাবু এবার পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে আদেশের সুরে বললেন, চাবুকটা ফেলে দিন! নইলে আমি গুলি করব!

সেলিম হা-হা করে হেসে উঠল।

তারপর সে আবার চাবুক তুলতেই তিনি বাধ্য হয়ে গুলি চালালেন।

তখন একটা আশ্চর্য ব্যাপার হল।

কাকাবাবু ওকে মারবার জন্য নয়, শুধু চাবুকটা ফেলে দেওয়ার জন্য ওর হাতের মুঠোয় টিপ করে গুলি চালিয়েছিলেন। গুলিটা ঠিক জায়গায় লাগল বটে, কিন্তু সেলিমের কিছুই হল না। বুলেটটা ঠক করে পড়ে গেল মাটিতে।

সেলিম আবার হেসে উঠে বলল, গোলা গা ডালা! গুলিতে আমার কিছুই হয় না।

কাকাবাবু একটুর জন্য হকচকিয়ে গিয়েও রিভলভারের ব্যারেলটা খুলে দেখে আসল ব্যাপারটা বুঝে গেলেন। আগের দিন আমির আলির বাড়িতে তার রিভলভারটা জমা রাখতে হয়েছিল। সেই সময় আসল গুলিগুলো সরিয়ে খেলনা গুলি ভরে দিয়েছে। তাই রিভলভারটা কেড়ে নেয়নি!

সেলিম আবার চাবুক তুলতেই কাকাবাবু শান্তভাবে বললেন, আমাকে ওভাবে মারতে যাবেন না সেলিম! আমার একটা শপথ আছে, কেউ যদি আমার গায়ে হাত তোলে, কিংবা কোনও কিছু দিয়ে আঘাত করে, তা হলে আমি কোনও না-কোনও সময় গুনে গুনে সেই আঘাত ফিরিয়ে দেব।

এবার আমির আলিও হেসে ফেললেন।

তিনি বললেন, এ আপনি কী বলছেন, রায়চৌধুরীবাবু! আপনি আর প্রতিশোধ নেবেন কী করে? সে সুযোগ তো আর পাবেন না। আপনাকে আমরা মেরে ফেলতে চাইনি। আজ রাত্তিরে আমাদের কাজ মিটে গেলে আপনাকে আবার অজ্ঞান করে কোথাও রেখে দিয়ে আসব। তারপর জীবনে আর আমাদের দেখা পাবেন না।

কাকাবাবু বললেন, আগেও অনেকেই এই কথা বলেছে। কিন্তু আমি ঠিক বেঁচে ফিরে আসি। কাউকে বিনা কারণে আঘাত করলে উলটে নিজেকেও একসময় সেই আঘাত পেতে হয়, এটা মনে রাখা ভাল।

সেলিম আবার চাবুক কষাল, কাকাবাবু গুনলেন, দুই। আবার চাবুক, আবার গুনলেন, তিন।

এবার আমির আলি হাত তুলে বললেন, ব্যস, ব্যস! আর দরকার নেই। রায়চৌধুরীবাবু, আপনি তো আচ্ছা গোঁয়ার! একবার মাপ চেয়ে নিলেই তো পারতেন, তা হলে আর মার খেতে হত না!

কাকাবাবু বললেন, আমার কাছেই ওঁকে মাপ চাইতে হবে, অবশ্যই!

সেলিম একটা ঘৃণার শব্দ করল, তারপর চেঁচিয়ে ডাকল, কাসেম। কাসেম!

একজন বন্দুকধারী লোক ঢুকে এল ঘরে।

সেলিম তাকে বলল, এই লোকটাকে অন্য ঘরে রেখে দে। দুপুরে কিছু খেতে দিবি না।

কাসেমের প্রায় দৈত্যের মতো চেহারা। সে কাকাবাবুর একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিতেই কাকাবাবু আর বাধা দিলেন না।

কাসেম তাঁকে টানতে টানতে পাশের ঘরে নিয়ে এসে ধাক্কা মেরে ভিতরে ফেলে দিল।

বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

সারাদিন কাকাবাবু বন্দি হয়ে রইলেন সেই ঘরে।

বাথরুমের জানলার গরাদ অনেক পুরনো, ভেঙে ফেলা এমন কিছু শক্ত নয়। কিন্তু তিনি সে চেষ্টা করলেন না। খোঁড়া পায়ে দোতলা থেকে লাফিয়ে নামবেন কী করে? ক্রাচ দুটো নেই। রিভলভারটাও অকেজো। এই অবস্থায় পালাবার চেষ্টা করারও কোনও মানে হয় না।

তিনি ঠিক করলেন, দেখাই যাক না, কী হয়!

সকালে কফির সঙ্গে ডিম আর কত কী দেবে বলেছিল, সেসব আর এল না। দুপুরে খাবার দিল না কিছু। তবে একটা থালায় যে অনেকরকম ফল ছিল, কমলালেবু, কলা, আপেল, সেটা সরিয়ে নেয়নি। মাঝে মাঝেই একটা করে ফল খেতে লাগলেন। একটা দিন শুধু ফল খেয়ে দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যায়।

দুপুরের দিকে তিনি খানিকটা ঘুমিয়েও নিলেন।

জেগে উঠে জানলা দিয়ে দেখলেন, বাইরের আকাশ আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছে। সারা বাড়িতে কোনও সাড়াশব্দ নেই। বাইরেও আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

সন্ধের একটু পরে দরজা খুলে গেল।

সেই বন্ধুকধারী কাসেম এসে বলল, চলো!

কাকাবাবু বাইরে আসতেই কাসেম তার হাত ধরতে গেল।

তিনি বললেন, হাত ধরতে হবে না। আমি এমনিই যাচ্ছি।

লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে যেতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এই রাইফেলটা কি অটোমেটিক নাকি?

কাসেম বলল, চুপ!

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে এরা কত টাকা মাইনে দেয়?

সে আবার বলল, চুপ!

কাকাবাবু বললেন, ও, মাইনের কথা জিজ্ঞেস করতে নেই, তাই না? বাড়িতে তোমার বউ, ছেলেমেয়ে আছে?

সে বলল, আছে!

এবার সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে। কাকাবাবু আগেই দেখে নিলেন, পাশের ঘরটায় আমির আলি কিংবা কেউ নেই।

কাসেম রাইফেলটা কাকাবাবুর দিকে তাক করে বলল, আস্তে আস্তে নামো। এদিক-ওদিক যাওয়ার চেষ্টা করবে না।

কাকাবাবু বললেন, পাগল নাকি! আমি এই খোঁড়া পায়ে দৌড়ে পালাতে পারব? আমার কোনও ক্ষমতাই নেই। আমাকে কেন ধরে রেখেছে, তাও জানি না। তুমি কিছু জানো?

সে বলল, না।

কাকাবাবু বললেন, তুমি হুকুম তামিল করছ মাত্র। ওরা যদি তোমায় হুকুম করে আমায় গুলি করে মেরে ফেলতে, তাও করবে নিশ্চয়ই?

কাসেম এবার কাকাবাবুর মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে। বলল, ওসব বাজে কথা বন্ধ করো!

বাড়ির বাইরে এসে খানিকটা জংলা জায়গা পার হতেই দেখা গেল অনেকটা ফাঁকা মাঠ, পাশে একটা পুকুর।

সেখানে দুদিকের দুটো খুঁটিতে দাউদাউ করে মশাল জ্বলছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দশ-বারোজন লোক। তাদের পাশে হুইল চেয়ারে বসে আছেন আমির আলি।

ফুটবলের একটা গোলপোস্ট রয়েছে একধারে। তার মাঝখানে গোলকিপারের মতো একজন মানুষ, কিন্তু তার দুটো হাত দুদিকের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। তার সামনাসামনি খানিকটা দূরে নবাব সিরাজদ্দৌল্লার মতন সেজে দাঁড়িয়ে আছে সেলিম, তার হাতে এখন খোলা তলোয়ার।

দৃশ্যটা প্রায় একটা বধ্যভূমির মতো। একটা-দুটো ক্যামেরা থাকলেই মনে হতে পারত, এসব কিছুই সত্যি নয়। সিনেমা তোলার জন্য সাজানো হয়েছে।

আসলে তো সত্যিই। এখানে সবাইকে দেখিয়ে সেলিম ওই হাত-বাঁধা লোকটিকে খুন করবে।

কাকাবাবু আগে সবদিক ভাল করে দেখে নিলেন।

যে দশ-বারোজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে কয়েকজনের চেনা মুখ। যে লোকটি হাজারদুয়ারির সিঁড়িতে সই চাইতে এসে ধাক্কা মেরেছিল। যে লোকটি গঙ্গার ধারে এসে দেশলাই চেয়েছিল। এবং হোটেলের মালিক কান্তবাবু। আর যাদের কাকাবাবু চেনেন না, তাদেরও মুখ দেখে মনে হয়, এখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমির আলি এ শহরের অনেককেই নিজেদের দলে টেনেছেন।

বন্ধুকধারী কাসেম ছাড়াও রয়েছে আর তিনজন পাহারাদার। তাদের কোমরে ঝুলছে তলোয়ার। বন্দুক নেই।

হাত-পা বাঁধা লোকটাকে তিনি চেনেন না।

কাকাবাবু প্রথমটায় একটু দমে গেলেন। তার চোখের সামনে একজন মানুষকে খুন করা হবে। তিনি আটকাবেন কী করে? তার রিভলভারটাও অকেজো। এত মানুষের সঙ্গে তিনি একা তো লড়তে পারবেন না।

কাসেম তাকে একপাশে বসিয়ে দিল।

এবার সেলিম বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলল, ফ্রেন্ডস অ্যান্ড কান্ট্রিমেন, এই যে লোকটাকে দেখছেন, এর পূর্বপুরুষের নাম মহম্মদি বেগ। আপনারা জানেন, সে কে?

হাত-পা বাঁধা লোকটি চেঁচিয়ে বলল, না, না, না!

সেলিম আবার বলল, বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লা আমার পূর্বপুরুষ। সেই মহান নবাবকে এই শয়তান মহম্মদি বেগ কী জঘন্যভাবে খুন করেছে তাও আপনারা জানেন। সেই বংশের সবাই শয়তান। এই শয়তানটাকে খুন করে আজ আমি আমাদের বংশের রক্তের ঋণ শোধ করব।

হাতবাঁধা লোকটি আবার চেঁচিয়ে বলল, আপনারা ভুল করছেন। ভুল করে আমাকে ধরে এনেছেন। মহম্মদি বেগ কে তা আমি চিনিইনা। কোনওদিন নাম শুনিনি। সে আমার পূর্বপুরুষ কী করে হবে? আমি মুসলমানও নই, আর্মেনিয়ান। আমার নাম ফিরোজ অ্যারাটুন শাহ?

সেলিম বলল, তোর মা মুসলমান ছিল। তোর সম্পর্কে সব খবর আমরা জানি। তুই হাজারদুয়ারি থেকে মহম্মদি বেগের ছুরিটা চুরি করেই আরও ফেঁসে গিয়েছিস।

ফিরোজ বলল, আমি তো ছুরি চুরি করিনি। আমি জীবনে কখনও চুরিজোচ্চুরি করিনি।

সেলিম বলল, আলবাত চুরি করেছিস! কেন চুরি করেছিস, তাও বলে দিচ্ছি! লোকে যখন মিউজিয়াম দেখতে যায়, কাচের বাক্সটার মধ্যে ওই ছুরিটার সামনে দাঁড়িয়ে যায়। তখন কেউ না কেউ মহম্মদি বেগের কুকীর্তির কথা শুনিয়ে দেয়। তখন প্রত্যেকে ঘেন্নায় মুখ কুঁচকোয়। ছুরিটা না দেখলে লোকে ওই লোকটার নামটা ভুলেই যেত! তাই তুই ছুরিটা সরিয়েছিস!

ফিরোজ বলল, ভুল! সব ভুল! আমি ওসব কিছুই জানি না। ছুরিটা অন্যরা চুরি করে আমার কাছে বিক্রি করেছে। আমি নানা দেশের ছুরি সংগ্রহ করি। আমার কাছে অন্তত দুশো রকমের ছুরি আছে। সেগুলো আমি সাজিয়ে রাখি আমার লন্ডনের বাড়িতে।

সেলিম বলল, অনেক কথা হয়েছে। আমরা সব জানি। এ সবই তোর মিথ্যে কথা। তোকে আর সময় দেওয়া হবে না।

ফিরোজ কাঁদোকঁদো হয়ে বলল, আমায় মারবেন না। আমিনবাব সিরাজকে শ্রদ্ধা করি। বিশ্বাস করুন, আমি মহম্মদি বেগের বংশের কেউ নই!

সেলিম তবু সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, এখন দেখুন, এই শয়তানটার শাস্তি। ওকে আমি টুকরো টুকরো করে কাটব।

তলোয়ার তুলে সে এক পা এক পা করে এগোতেই কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, এ কী করছেন? এ লোকটির পরিচয় এখনও ঠিকমতো প্রমাণ হল না। যদি ও ওই বংশের কেউ না হয়!

সেলিম মুখ ফিরিয়ে ঘৃণার সঙ্গে বলল, ইউ শাট আপ!

কাকাবাবু তখন স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে গিয়ে একজন প্রহরীর কোমর থেকে তলোয়ারটা এক টানে খুলে নিলেন।

তাঁর মতো একজন খোঁড়া লোক যে এমনভাবে লাফাতে পারেন, তা প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়। প্রহরীটি বাধা দেওয়ারও সময় পেল না।

কাকাবাবু ফিরোজকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললেন, একজন নিরস্ত্র লোককে হাত-পা বেঁধে এইভাবে খুন করা হবে, আর সকলে তাই দাঁড়িয়ে দেখবে? ছিঃ!

সেলিম বলল, সরে যাও, নইলে তুমি আগে মরবে!

কাকাবাবু বললেন, ঠিক আছে। লড়ে যান আমার সঙ্গে। তারপর ওকে মারবেন!

সেলিম নাক কুঁচকে বলল, আমি কোনও খোঁড়া লোকের সঙ্গে লড়ি না। হঠ যাও! যদি মরতে না চাও ...

কাকাবাবু বললেন, আমাকে না মেরে ওকে মারতে পারবেন না! খোঁড়া হয়েছি বটে, কিন্তু এ লড়াইয়ের জন্য আমার দুটো হাত আর একটা পা-ই যথেষ্ট!

তিনি উলটো দিকে চট করে ঘুরে তলোয়ার চালিয়ে ফিরোজের দুহাতের দড়ি কেটে দিলেন।

আবার সামনে ফিরে বললেন, কই, আসুন!

সেলিম বলল, তোমাকে এখনই মেরে ফেলার ইচ্ছে আমার ছিল না। তুমি নিজেই যখন মরতে চাও … কাসেম, এ লোকটাকে গুলি করে শেষ করে দে!

কাসেম রাইফেলটা তুলে তাক করতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, ছিঃ! আমার সঙ্গে তলোয়ারের লড়াই করার সাহসও তোমার নেই! তুমি আবার নবাব সাজতে চাইছ?

সেলিম পাগলের মতন চিৎকার করে বলল, কাসেম, কাসেম, দেরি করছিস কেন?

আর তখনই একটা সিনেমার মতো কাণ্ড হল। হঠাৎ শোনা গেল কপাকপ কপাকপ করে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ। ছুটে আসছে সেই সাদা ঘোড়া। সেটা খুব জোরে আসছে কাকাবাবু আর কাসেমের দিকে। ঘোড়াটার পিঠে সন্তু আর জোজো।

সেলিম অবাক হয়ে বলল, আমার দুলদুল, ও চুরি করেছে। ধর, ওকে

ধর!

কাসেম বন্দুকের নল ঘোরাল ঘোড়াটার দিকে।

সেলিম আবার আর্ত গলায় চেঁচিয়ে বলল, এই, এই, আমার দুলদুলের গায়ে যেন গুলি না লাগে!

কাসেম বুদ্ধি করে বন্দুকের নলটা উঁচু করে আকাশে গুলি ছুড়ল। সেই আওয়াজে ঘোড়াটা থমকে গেল, সামনের দুপা উঁচু করে ডেকে উঠল।

কিন্তু সন্তু আর জোজো পড়ে গেল না।

সন্তু বলল, শক্ত করে ধরে থাক।

ঘোড়াটা আবার সামনের পা মাটিতে নামাতেই সন্তু এবার আরও জোরে চার্জ করল। একটা খুঁটি থেকে তুলে নিল একটা মশাল। রে রে রে রে চিৎকার করে সে তেড়ে এল কাসেমের দিকে।

এবার কী করবে, তা কাসেমের বুদ্ধিতে কুলোল না, সে ভয় পেয়ে পালাতে গেল। ঘোড়াটা এসে পড়ল তার পিঠের উপর।

সে মাটিতে পড়ে যেতেই কাকাবাবু তার রাইফেলটা কেড়ে নিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সেটা সেলিমের বুকে ঠেকিয়ে বললেন, এবার তোমার পাগলামির শেষ! তলোয়ারটা ফেলে দাও!

সেলিম তবু তলোয়ারটা নিয়ে কটমট করে তাকিয়ে রইল।

কাকাবাবু বললেন, একটু আগে তুমি আমায় মারতে বলেছিলে। এখন আমি তোমাকে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারি। যদি এখনও বাঁচতে চাও, হাতের অস্ত্র ফেলে দাও।

এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন আমির আলি। এবার ভাঙাভাঙা গলায় বললেন, ওরে সেলিম, তলোয়ারটা ফেলে দে! আর আশা নেই।

কাকাবাবু অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, যার কাছে যা অস্ত্র আছে, সব নামিয়ে রাখো পায়ের কাছে। কেউ এদিক-ওদিক করার চেষ্টা করলেই আগে এই সেলিম মরবে!

সন্তু আর জোজো ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে এল কাকাবাবুর কাছে।

কাকাবাবু বললেন, শাবাস সন্তু আর জোজো। দ্যাখ, কার কাছে কী অস্ত্র আছে, সব এক জায়গায় জড়ো কর। কেউ যেন এখান থেকে না পালায়!

সন্তু আর জোজো প্রত্যেককে সার্চ করতে লাগল। দেখা গেল, যাদের মনে হয়েছিল বিশিষ্ট ভদ্রলোক, তাদেরও কারও কারও কাছে রয়েছে ছুরি। কান্তবাবুর কোমরে একটা ভোজালি।

সন্তু তাঁকে বলল, পুলিশ আপনাকে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল?

জোজো বলল, এবার আর সহজে ছাড়বে না। আপনার হোটেল লাটে উঠে যাবে!

কাকাবাবু সেলিমকে বললেন, তুমি এবার হাঁটু গেড়ে বসো। তোমাকে চাবুক মারা হবে। তিন ঘা। তারপর তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেব!

সেলিম এবার সত্যিকারের পাগলের মতো বিকট গলায় চিৎকার করে বলল, ওরে রায়চৌধুরী, তুই আমার কিছুই করতে পারবি না। পুলিশ আমায় ছুঁতে পারবে না। আমি আবার তোকে ধরব। আর ওই মহম্মদি বেগের আওলাদটাকে কুচিকুচি করে কাটব! আমি বাংলার নবাব!

ফিরোজ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল যেন, সে ভয়ে চুপসে গেছে। এবার সে অন্য মূর্তি ধরল।

মাটি থেকে একটা তলোয়ার টপ করে তুলে নিয়ে সেও কর্কশ গলায় বলল, সে সুযোগ তোকে আর দেব না সেলিম! আমি সত্যিই মহম্মদি বেগের বংশধর। তিনি ছিলেন একজন বীরপুরুষ। অত্যাচারী সিরাজের গায়ে কেউ হাত তোলার সাহস করেনি, তিনিই শুধু ভয় পাননি। সিরাজ মহম্মদি বেগকে একদিন বলেছিল, রাস্তার কুকুর। তার শোধ তিনি নিয়েছেন। আজও সে অপমান আমরা ভুলিনি। আজ সিরাজের বংশধরকে আমি শেষ করে দেব?

তলোয়ারটা নিয়ে সে ছুটে এল সেলিমের দিকে। তার চোখ-মুখ সাংঘাতিক হিংস্র।

কাকাবাবু একটু পিছিয়ে গিয়ে গুলি চালালেন তার দিকে। সে সেলিমের খুব কাছে গিয়েও দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে। রক্তের ধারা গড়িয়ে এল।

এই ঘটনায় হঠাৎ আবার বদলে গেল সেলিম। একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুখ। সে কাপাকাপা গলায় বলল, আব্বাজান, এই লোকটা আমাকে মারতে এসেছিল। সত্যি সত্যিই মেরে ফেলত? আর এই রায়চৌধুরীটা, ও আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে?

এখন তার গলায় আর একটুও অহংকারের ভাব নেই।

আমির আলি কোনও কথা বললেন না।

জোজো শুকনো গলায় বলল, কাকাবাবু, শেষ পর্যন্ত আপনিই ও লোকটাকে মেরে ফেললেন?

কাকাবাবু দুদিকে মাথা নাড়লেন।

তারপর বললেন, আমার টিপ এখনও খারাপ হয়নি। আমার গুলি ওর হাতের চামড়া ঘেঁষে গিয়েছে, লাগেনি। ও ভয়ের চোটে ওরকমভাবে পড়ে আছে।

জোজো বলল, অনেক রক্ত গড়াচ্ছে যে!

কাকাবাবু বললেন, ওর হাতে তলোয়ার ছিল, তাতেই বোধহয় খোঁচাটোচা লেগেছে! ওকে উলটে দিয়ে দ্যাখ তো?

সন্তু আর জোজো গিয়ে ফিরোজকে উলটে দিতেই দেখা গেল, সে চোখ। পিটপিট করছে। তার থুতনিটা কেটে গিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে সেখান থেকে, গুলিটুলি সত্যিই লাগেনি।

কাকাবাবু বললেন, এ লোকটাও তো দেখছি খানিকটা পাগল। জানিস তো, যাদের মধ্যে পাগলামি থাকে, তারা আসলে ভিতু হয়। এমনিতে দাত কিড়মিড় করে সাহস দেখায়, কিন্তু একটা হঠাৎ ধাক্কা খেলে ভয়ে কাঁপে। সেলিমকে দ্যাখ না, অত চ্যাঁচামেচি করছিল, এখন মনে হচ্ছে, ওর মেরুদণ্ড বলে কিছু নেই!

রাইফেলটা তুলে সবাইকে তিনি বললেন, যে যেখানে আছ, সেখানেই থাকো। কেউ নড়বে না। সবাইকে থানায় যেতে হবে।

বলতে বলতেই তিনি দেখলেন, দেশলাই-চাওয়া লোকটি দৌড় মারবার চেষ্টা করছে।

কাকাবাবু গুলি চালালেন তার পা লক্ষ্য করে। একটা গুলি তার পায়ে লেগেছে। সে চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

কাকাবাবু তার দিকে আর মনোযোগ না দিয়ে সন্তুকে বললেন, থানায় খবর দিতে হবে। এখানে কারও কাছে মোবাইল ফোন নেই?

জোজো বলল, হোটেলওয়ালা কান্তবাবুর কাছে একটা দেখেছি।

কাকাবাবু বললেন, সেটা নিয়ে এসো। নম্বরটাও জেনে নিয়ে ওর কাছে।

জোজো ছুটে গেল।

কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই একেবারে ঠিক সময় এসে হাজির হলি কী করে রে?

সন্তু বলল, সেটা বেশ মজার ব্যাপার। আমি বেশি কিছু না ভেবেই সেলিমসাহেবের ঘোড়াটা চুরি করেছিলাম। খানিকক্ষণ ঘোড়া ছোটালাম গঙ্গার ধারে। এক-একবার দেখি কী, ঘোড়াটার রাশ আলগা করলেই সেটা নিজে নিজে একদিকে যাচ্ছে। বাঁক নিচ্ছে। তখন আমার মনে পড়ল, কোথায় যেন পড়েছি, ঘোড়ার পিঠে যদি অন্য কেউ চাপে, আর

সে যদি জোর না করে, তা হলে ঘোড়া তার মনিব যেখানে আছে, সেখানে চলে যায়। তাই আমি ভাবলাম, দেখা যাক তো, ওর মনিব কোথায় আছে। এখানে এসে পৌঁছোলাম খানিকটা আগে। গাছের আড়ালে অপেক্ষা করছিলাম। এখানকার কাণ্ডকারখানা দেখে বুঝতে পারছিলাম না, কী করা যায়। যখন দেখলাম, একটা লোক তোমাকে বন্দুক উঁচিয়ে গুলি করতে যাচ্ছে, তখন আর কোনও কিছু চিন্তা না করে এদিকে ছুটিয়ে দিলাম ঘোড়া।

কাকাবাবু বললেন, একেবারে ঠিক ঠিক সময়ে এসে গিয়েছিস। সত্যি কথা কী জানিস সন্তু, এবারে আমি একটুখানি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমি নিজেও বাঁচব না। ওই ফিরোজকেও বাঁচাতে পারব না। তরোয়াল দিয়ে কি রাইফেলের গুলি আটকানো যায়!

জোজো মোবাইল ফোনটা নিয়ে এসে বলল, কাকাবাবু, হোটেলওয়ালা একটা নম্বর বলেছে থানার। ঠিক কিনা কে জানে। চেষ্টা করে দেখব?

কাকাবাবু উত্তর দেওয়ার আগেই আমির আলি জিজ্ঞেস করলেন, রায়চৌধুরীবাবু, আমি একটা কথা বলতে পারি?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, বলুন!

আমির আলি বললেন, আপনি কি সত্যি সত্যি আমাদের থানায় নিয়ে যাবেন?

কাকাবাবু বললেন, এর মধ্যে মিথ্যেমিথ্যির কী আছে? মানুষকে খুন করা দারুণ অপরাধ। খুনের চেষ্টাও অপরাধ। আপনার ছেলে সেলিম আর ফিরোজ, ওরা দুজনেই খুন করতে গিয়েছিল। ওদের তো শাস্তি পেতেই হবে। আর আপনারা, খুনের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যও অপরাধী, আইনের চোখে। এখন আইনই আপনাদের শাস্তি দেবে!

আমির আলির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল।

ধরা গলায় তিনি বললেন, আমাদের বনেদি, খানদানি বংশ। সাধারণ অপরাধীদের মতো আমাদের থানায় আটকে রাখবে, এর চেয়ে আমার মরে যাওয়াও ভাল ছিল।

কাকাবাবু ধমকের সুরে বললেন, আমির আলি সাহেব, আপনাদের ভাল বংশ, অনেক টাকা, ব্যবহারও ভদ্র। তবু আপনি এরকম একটা খুনকে সমর্থন করেছিলেন? আপনার ছেলের পাগলামির রোগ, ওর চিকিৎসা করা উচিত ছিল। তার বদলে আপনি ওকে প্রশ্রয় দিয়ে ওরই ক্ষতি করেছেন। এ যুগে কেউ রাজা কিংবা নবাব হতে চায়, সেটা কি সম্ভব? আড়াইশো বছর আগের ঘটনা নিয়ে কেউ প্রতিশোধ নিতে চায়? এটা পাগলামি ছাড়া আর কী? ওর সঙ্গে সঙ্গে আপনিও পাগল হয়েছিলেন?

আমির আলি বললেন, হয়তো তাই। আমারও মাথার ঠিক ছিল না। এখানকার অনেক লোক একটা কথা বলেছিল, আপনি যেখানে থাকবেন, সেখানেই একটা কিছু গন্ডগোল হবে!

কাকাবাবু জোর দিয়ে বললেন, না, মোটেই তারা ঠিক কথা বলেনি। যদি অন্যায়, অপরাধ কিছু না ঘটে, সেখানে তো আমি গন্ডগোল করি না। চুপচাপ থাকি। কিন্তু চোখের সামনে যদি কিছু অন্যায় ঘটতে দেখতে পাই, তখন তো বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবই। আপনি তো রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন, এটা জানেন না, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, এরা দুজনেই সমান অপরাধী। আমি অন্যায় সহ্য করতে পারি না।

আমির আলি বললেন, তাও ঠিক। একটা অনুরোধ করব আপনাকে? আমাকে থানায় দেওয়ার বদলে আপনি এখানেই আমাকে একটু গুলি চালিয়ে মেরে ফেলুন। আমি হার্টের রুগি, আমি এখন মরে গেলেও ক্ষতি নেই। তার বদলে আপনি আমার ছেলে সেলিমকে ছেড়ে দিন।

কাকাবাবু বললেন, আপনি জানেন না। অনেকেই জানে না, আজ পর্যন্ত আমি একজন মানুষকেও মারিনি। চরম বিপদের মধ্যে পড়েও আমি কাউকে একেবারে মেরে ফেলার কথা ভাবতে পারি না। আপনার ছেলের প্রাপ্য আছে, তিন ঘা চাবুক। আর জেলখাটার

শাস্তি। আপনি আমাকে এখনই কথা দিন যে, কোনও এক সময় আপনি নিজেই ওকে তিন ঘা চাবুক মারবেন, তা হলে আমি আর নিজের হাতে সেই শাস্তি দেব না। আর জেলখাটার ব্যাপারটা ... কী করা যায় বল তো সন্তু?

সন্তু বলল, সেলিম আর ফিরোজ যদি দুজনে দুজনের কাছে ক্ষমা চায়, তা হলে ওদের ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। তাই না রে জোজো?

জোজো বলল, ওরা হাতে হাত মিলিয়ে ভেউভেউ করে কাঁদুক!

কাকাবাবু এবার হেসে বললেন, ভেউভেউ শব্দ করে সকলেই তো কঁদে না। তবে হাতে হাত মেলাবার ব্যাপারটা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

আমির আলি সাহেব, আপনিই দেখুন, যদি ব্যবস্থা করতে পারেন।

সেলিম আর ফিরোজ একটু দূরে দূরে মাটিতে এলিয়ে শুয়ে আছে।

আমির আলি সাহেব তাদের কাছে গিয়ে কী যেন বললেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে জানালেন, না, ওরা রাজি নয়, আমার কথা শুনবে না।

কাকাবাবু, সন্তু আর জোজো ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কাকাবাবু কড়া গলায় বললেন, সেলিম, তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি হলে। এবারে তোমাকে গুনে গুনে তিন ঘা চাবুক খেতে হবে। তারপর তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেব। সেখানে তুমি ছিচকে চোর আর পকেটমারদের সঙ্গে জেলে থাকবে! পুলিশ যাতে তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে না দেয়, তা আমি দেখব। সে ক্ষমতা আমার আছে।

সেলিম এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, এখন কাঁদলেও ক্ষমা পাবে না।

অন্য লোকটার দিকে ফিরে তিনি বললেন, ফিরোজ, তোমাকে আমি নির্দোষ ভেবে প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিলাম। এখন দেখছি, তুমিও একজন খুনি! তা হলে জেলেই কাটাও বাকি জীবন।

ফিরোজ গড়িয়ে এসে কাকাবাবুর পা ধরে বলল, আমায় ক্ষমা করুন। আমি বাঁচতে চাই।

কাকাবাবু পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, আমার কাছে ক্ষমা চাইবার দরকার নেই। দুজনে দুজনের নামে ক্ষমা চাও।

সেলিম আর ফিরোজ উঠে বসে প্রথমে পরস্পরের হাত ধরল, তারপর দুজনে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল।

কাকাবাবু বললেন, ব্যস, ব্যস, মুখে আর কিছু বলবার দরকার নেই।

অন্য পাশে ফিরে তিনি বললেন, আমির আলি সাহেব, আপনারা এখানে একটা খুনের দৃশ্য দেখতে এসেছিলেন। তার বদলে, দুজন মানুষের ক্ষমা করার দৃশ্য অনেক সুন্দর নয়? আমি এমন চমৎকার দৃশ্য বহুদিন দেখিনি!

মেঘ সরে গিয়ে এখন জ্যোৎস্না ফুটেছে আকাশে। তার মধ্যে আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে দুলদুল ঘোড়াটা।

কাকাবাবু বললেন, দ্যাখ, দ্যাখ সন্তু, কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওই সাদা ঘোড়াটাকে। ও যেন পৃথিবীতে হিংসে, রাগ, খুনোখুনির ব্যাপার কিছুই জানে না!